পাঞ্জেরী
সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ

ফ্রান্সিস পার্কম্যান

অরিগনের পথে



বয়স
১৩+

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু


Banglapdfboi.com
মাসুদ রানা
সেই কুয়াশা
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন


মাসুদ রানা
সেই কুয়াশা
দ্বিতীয় খণ্ড
Banglapdfboi.com


মাসুদ রানা
সূর্য-সৈনিক
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
Banglapdfboi.com


মাসুদ রানা
সূর্য-সৈনিক
দ্বিতীয় খণ্ড
Banglapdfboi.com


হরর কাহিনি
Banglapdfboi.com
হাকিনী
অনীশ দাস অপু সম্পাদিত


Banglapdfboi.com
ছোটদের যত লেখা
হুমায়ূন আহমেদ


দ্য
কনফেসর
Banglapdfboi.com
ড্যানিয়েল সিলভা


জেফরি আর্চার'র
শ্যাল উই টেল
দ্য প্রেসিডেন্ট
Banglapdfboi.com


মাসুদ রানা
Banglapdfboi.com
অগ্নিশপথ
কাজী আনোয়ার হোসেন


Banglapdfboi.com
কাজী আনোয়ার হোসেন

অরিগনের পথে

(The Oregon Trail)

মূল : ফ্রান্সিস পার্কম্যান

রূপান্তর : অনীশ দাশ অপু



পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

এই বইয়ে তোমরা যাদের মুখোমুখি হবে

ফ্রান্সিস পার্কম্যান: কাহিনীর কথক। ১৮৪৬ সালে তিনি আমেরিকার দুর্গম পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর ভ্রমণকাহিনী *দ্য ওরিগন ট্রেইল* নামে প্রকাশ করেন।

কুইন্সি অ্যাডামস শ: আত্মীয়তাসূত্রে ফ্রান্সিসের ভাই। তিনি ফ্রান্সিসের সাথে অরিগনের পথে ভ্রমণ করেন।

হেনরী শ্যাতিলন: একজন ফরাসী গাইড। শক্তিশালী ও দক্ষ শিকারী।

ডেসলরিয়েসঁ: ঘোড়া এবং খচ্চরের রক্ষণাবেক্ষণকারী একজন কানাডিয়ান।

কিয়ার্সলি: একটি ওয়াগনের সারির দলনেতা।

রেমন্ড: একজন কানাডিয়ান শিকারী।

ক্যাপ্টেন সি
মি. আর
জ্যাক
তিনজনই ইংরেজ। শিকারের খোঁজে তাঁরা আমেরিকা চষে বেড়ান।



লেখকের কথা

ফ্রান্সিস পার্কম্যানের জন্ম ১৮২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে। ছোটবেলায় তাঁর শারীরিক অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে তাঁকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে রাখার জন্য নানার বাড়ি মিডফোর্ডে পাঠানো হয়। সেখানে চার বছর থাকার সময় তার মনে জন্ম নেয় প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালোবাসা। বৈরী পরিবেশে বেঁচে থাকার কলাকৌশল সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে প্রাপ্ত শিক্ষা ফ্রান্সিসের পরবর্তী জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ফ্রান্সিস হার্ভার্ড কলেজে ভর্তি হন ষোল বছর বয়সে। বিশ বছর বয়সে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। ১৮৪৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পরে তাঁর বাবা তাঁকে আইন কলেজে ভর্তি করে দেন। আইন পড়া শেষ করলেও ফ্রান্সিস আইন চর্চার পথে পা বাড়াননি। ইতিহাস পড়া এবং এই বিষয়ক লেখালেখিতে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল। ফলশ্রুতিতে তিনি ইতিহাস বিষয়ক বই লিখতে শুরু করেন। এই মধ্যে, ১৮৪৬ সাল নাগাদ ফ্রান্সিস তাঁর নিকটাত্মীয় কুইন্সি অ্যাডামস শ সহ বুনো পশ্চিম ভ্রমণে বের হন। অনুন্নত এবং সভ্যতার ছোঁয়াবিহীন আমেরিকার আদিবাসীদের সে এত কাছ থেকে নিবিড়ভাবে সম্ভবত তাঁর মতো আর কেউ দেখেনি। এক দীর্ঘ অভিযান শেষে ফ্রান্সিস বাড়িতে ফিরে লিখতে শুরু করেন তাঁর অবিস্মরণীয় অভিযানের কাহিনী। অভিযানের বিবরণ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৫৯ সালে এই অভিযানের কাহিনী *দ্য অরিগন ট্রেইল* বই আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর লেখা সাত খণ্ডের ইতিহাস বিষয়ক বই ফ্রান্স অ্যান্ড ইংল্যান্ড ইন নর্থ আমেরিকা তাকে প্রচুর খ্যাতি এনে দেয়।

১৮৯৩ সালের ৮ নভেম্বর ফ্রান্সিস পার্কম্যানের জীবনবসান হয়।


উপযুক্ত পোশাক আর প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়ে আমরাও প্রস্তুত।

১. সীমান্ত

'ফ্রান্সিস পার্কম্যান!' চিৎকার করে উঠল আমার বন্ধু কুইন্সি অ্যাডামস শ; ও আমার ভাইও হয় বটে। 'আমাদের হার্ভার্ডের বন্ধুরা বা বাবা-মা যদি এই অবস্থায় আমাদের দেখত!'

'তো কুইন্সি,' বললাম আমি, 'বুনো ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে দেখতে চাইলে ওদের নিজেদের এলাকায় তো আমাদের যেতেই হবে। আর এজন্য পশ্চিমে রকি মাউন্টেন পর্যন্ত পাড়ি দিতে হবে। যাত্রাটা বেশ কঠিন, এটাকে সহনশীল করতে উপযুক্ত পোশাক আর প্রয়োজনীয় রসদপত্র সাথে নিতে হবে।' ওর পোশাকে চোখ বুলালাম আমি, তারপর নিজেরটাতে। 'আর আমরাও প্রস্তুত।'

আমরা লাল ফ্ল্যানেলের শার্ট পরেছি, কোমরে বেল্ট, নরম চামড়ার লেগিং আর পায়ে মোকাসিন। হোলস্টারে ঝুলছে ভারী পিস্তল। কুইন্সির হাতে ডাবল ব্যারেল শটগান। আমি নিয়েছি ১৫ পাউন্ড রাইফেল। আমাদের ছোট গাড়িটির সাদা ছইয়ের নিচে আরও আছে একটা তাঁবু, গোলাবারুদ, কম্বল, খাবার এবং ইন্ডিয়ানদের জন্য চমৎকার সব উপহার।

'আমাদের পোশাক-আশাক,' কুইন্সির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নজর বুলালাম ঘোড়া এবং খচ্চরগুলোর দিকে, 'সাজসজ্জায় আহামরি না হলেও অভিযানের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত।'

এটা ছিল ১৮৪৬ সালের মে মাস। কুইন্সি আর আমি হাজির হয়েছি মিসিসিপি-মিসৌরী নদীর পাড়ের ওয়েস্ট পোর্টে। ওয়েস্ট পোর্টকে ভাবা হতো বুনো এলাকা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্তের শেষ বিন্দু। অভিবাসীদের পরিভাষায় ওটাকে বলা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'ঝাঁপিয়ে-পড়া'র এলাকা। ওই বুনো এলাকার ওপারে অরিগন আর ক্যালিফোর্নিয়া। দুটি রাজ্যেই হাজার চারেক মার্কিন বসতি ছিল। তবে ১৮৪৬ সালে প্রায় তিন হাজার অভিবাসী অরিগন ট্রেইল ধরে বিপজ্জনক যাত্রায় নেমেছিল।

মাসখানেক আগে, এপ্রিলে আমরা এসে পৌঁছি সেন্ট লুইসে। গোটা শহর মানুষে গমগম করছিল। দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে অগণিত মানুষ বসতি করতে আগ্রহী হয়ে দূর পশ্চিমের ভূমিতে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ব্যবসায়ীরা গাড়ি ভর্তি করে যাত্রা করছিল নিউ মেক্সিকোর রাজধানী সান্তা ফে-র উদ্দেশে।



আমাদের ছোট্ট গাড়িটিতে রসদপত্র নিয়ে আমরা প্রস্তুত

সেন্ট লুইসের হোটেলগুলোতে লোক যেন আর আঁটছিল না। কামার এবং জিনব্যবসায়ীরা ভ্রমণকারীদের কাছে দেদারসে বিক্রি করছে জিনিসপত্র। বাষ্পচালিত জাহাজ মিসৌরী নদী ধরে যাত্রী নিয়ে চলেছে সীমান্তের দিকে।

২৮ এপ্রিল আমি আর কুইন্সি একটা বাষ্পচালিত জাহাজে সেন্ট লুইস ছাড়লাম। জাহাজটা বাণিজ্যিক পণ্য, গাড়ি, খচ্চর, ঘোড়া, জিন, লাগাম, তাঁবু খাটানোর জিনিসপত্র আর সান্তা ফে ও অরিগনমুখী যাত্রীসহ ঠাসা



বাষ্পচালিত জাহাজ মিসৌরী নদী ধরে যাত্রী নিয়ে চলেছে সীমান্তের দিকে

ছিল। অতিরিক্ত ভার বহনের ফলে ওটা ছিল প্রায় ডুবুডুবু। নদীর পানি প্রায়ই ছলকে উঠছিল মেঝেতে।

প্রায় এক সপ্তাহ উজান স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কখনও বালিয়াড়ি পাশ কাটিয়ে, কখনও পানির নিচে লুকিয়ে থাকা গাছের ডালের সঙ্গে জাহাজের তলা ঘষা খেয়ে এগিয়ে চলল জাহাজ। কখনও কখনও গাছগুলো মাঝ নদীতে পর্যন্ত জন্মেছে। ওগুলোর মোটাসোটা ডালগুলো



মাঝনদীতে গাছগুলো বা মোটাসোটা ডালগুলো একেকটা মৃত্যু ফাঁদ

একেকটা মৃত্যু ফাঁদ। কোনও জাহাজ ওগুলো এড়িয়ে চলতে না পারলে তলা ফুটো হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়।

আমরা নদীতে চলতে চলতে পশ্চিমে আগের অভিযাত্রীদের চলার চিহ্ন দেখতে পেলাম। ওরা অভিবাসীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র মিসৌরীর ইনডিপেনডেন্সে যাবার পথে নদীর ধারে খোলা আকাশের নিচে তাঁবু খাটিয়েছে।



ইনডিপেনডেন্স ঘাটে নোঙর করল আমাদের জাহাজটি

ইনডিপেনডেন্স ঘাটে নোঙর করল আমাদের জাহাজটি। তীরে চওড়া হ্যাট মাথায় অনেক মেক্সিকান চোখে পড়ল, এরা সান্তা ফে-র ব্যবসায়ীদের হয়ে কাজ করে। লম্বাচুলো চামড়ার পোশাক পরা ফরাসি শিকারিদেরকেও চোখে পড়ল, বোঝা গেল তারা মাত্র পাহাড় থেকে ফিরেছে শিকার করে। এসেছে লম্বা চওড়া জোয়ান অভিযাত্রীরা, রাইফেল আর কুঠার হাতে যারা আলেঘেনি পর্বতমালা থেকে পশ্চিম প্রেইরীতে

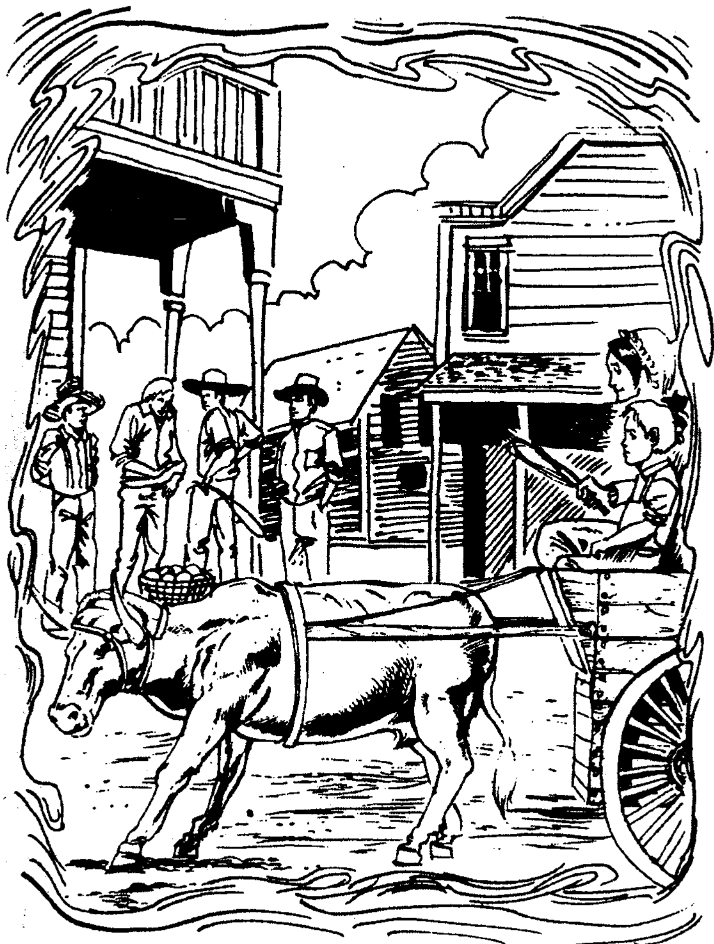
যাবার রাস্তা তৈরি করেছে। ওরাও তখন হয়তো অরিগন যাচ্ছিল, দুর্দান্ত-হৃদয় এই অভিযাত্রীদের পক্ষে অরিগনের রোমাঞ্চভরা অভিযানের হাতছানি উপেক্ষা করা মুশকিল।

শহর লোকে লোকারণ্য। অভিবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে নতুন নতুন উপনিবেশকারীরা আসছে। অভিবাসীদের ক্যাম্প আট মাইল দূরের প্রেইরীতে। রাস্তায় একইসঙ্গে যাতায়াত করছে মানুষ, ঘোড়া এবং খচ্চর। অন্তত ডজনখানেক কামারের দোকান থেকে অনবরত ঝনঝন-ঠনঠন হাতুড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে, ওয়াগন মেরামতি আর ঘোড়া এবং ষাঁড়ের জন্য লোহার খুর তৈরিতে ব্যস্ত ওরা।

ইলিননিস থেকে অভিবাসীদের এক ঝাঁক মালটানা গাড়ি এসে প্রধান সড়কে থেমেছে। গাড়ির পর্দা তুলে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে স্বাস্থ্যবান শিশুরা। ঘোড়ার পিঠে বসা মোটাসোটা এক তরুণী রোদে পোড়া মুখটার ওপর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা ছাতা মেলে ধরেছে। গোবেচারা ধরনের চাষারা হাতে চাবুক নিয়ে তাদের ষাঁড়গুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এদেরকে দেখে একটা কথাই মনে হলো, 'এরা সবাই পশ্চিমে যাচ্ছে কেন? সচ্ছল জীবনের আশায়, সমাজের নিয়ম-কানুন আর আইনকে ঝেড়ে ফেলতে চায়, নাকি স্রেফ অভিযানের নেশা? ওখানে পৌঁছে ওরা আরও হতাশ হবে না তো?'

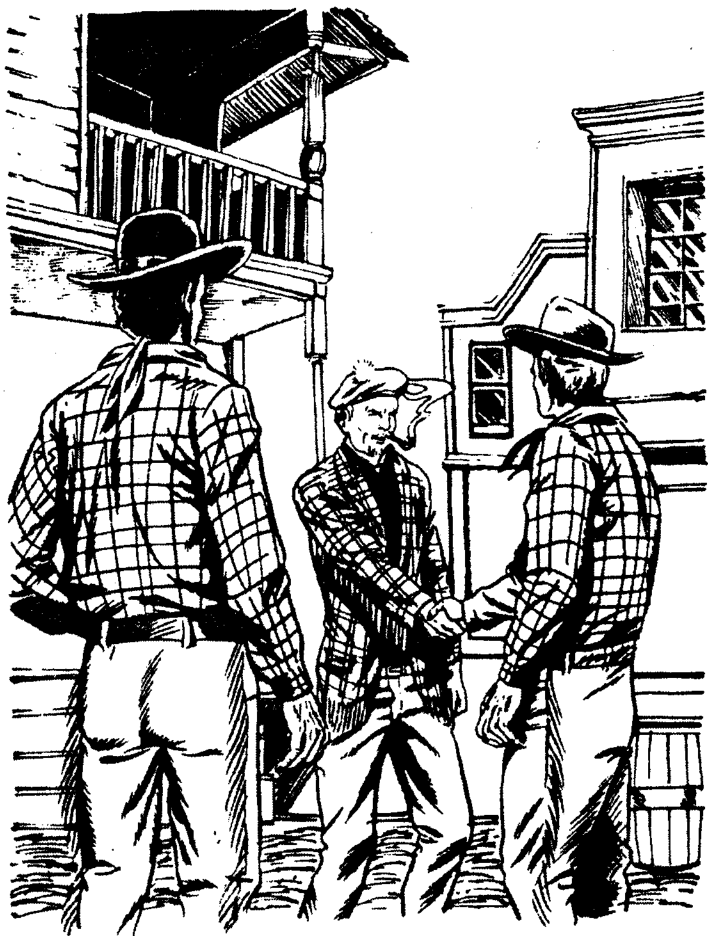
মিসিসিপি মিসৌরীর মোহনা থেকে পাঁচশ মাইল দূরে কানসাসে পৌঁছে আমরা জাহাজ থেকে নামলাম। তারপর ওয়েস্ট পোর্টগামী একটি গাড়িতে উঠে পড়লাম আমরা। ইচ্ছে সেখান থেকেই অভিযানের জন্য ঘোড়া আর খচ্চর কিনে নিতে পারব।

ওয়েস্ট পোর্টে ইন্ডিয়ানদের ছড়াছড়ি। এখানে আছে মাথা ন্যাড়া, মুখে বিচিত্র উল্কিওয়ালা স্যাক এবং ফক্স ইন্ডিয়ান। রয়েছে ফ্রক পরা শওনি এবং ডেলাওয়ার ইন্ডিয়ান, ওদের সবার মাথায় পাগড়ি। উইয়ানডট ইন্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের মতো পোশাক পরে। কয়েকজন ভবঘুরে কানসাস ইন্ডিয়ান গায়ে চড়িয়েছে পুরোনো কম্বল। রাস্তায় অলস ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওরা, ওদের টাট্টু ঘোড়াগুলো বেড়ার সাথে বাঁধা।



অভিবাসীদের জন্য মালটানা গাড়ি এসে প্রধান সড়কে থেমেছে

সরাইখানার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, পরিচিত একজনকে চোখে পড়ল। ওরকম লাল রঙের দাড়ি-গোঁফঅলা মানুষ আমি ওই একজনকেই দেখেছি। ইনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন সি, সঙ্গে তার ভাই জ্যাক এবং জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক মি. আর। তারা শিকারে বেরিয়েছেন। সেন্ট লুইসেতে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। আজ আবার এখানে দেখা হয়ে গেল।



ইনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন সি

কুশল বিনিময় শেষে ক্যাপ্টেন সি বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'মি. পার্কম্যান, পাহাড়ে শিকার অভিযানের জন্য আমাদের দলটি খুবই ছোট। আপনি এবং মি. অ্যাডামস শ তো ওদিকেই যাচ্ছেন। আসুন না, আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, দলটা ভারী হোক!'

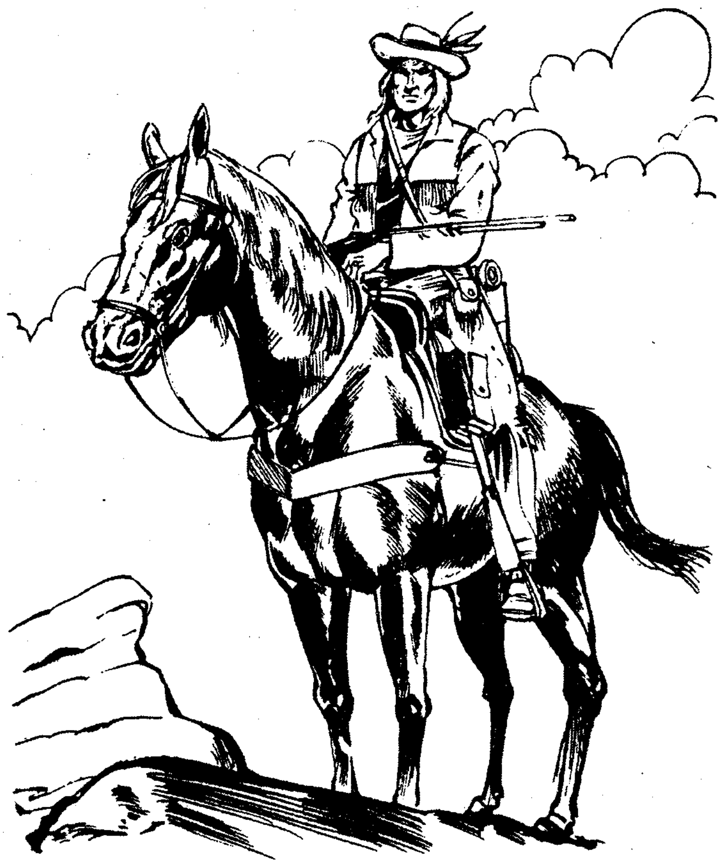
'বেশ, তো, ক্যাপ্টেন সি,' বললাম আমি, 'আপনি নিশ্চয়ই ওই অভিবাসী



ওই লোকগুলোর সাথে কিছুতেই নয়

দলগুলোর কোন একটির সাথে যাবার কথা ভাবছিলেন?'

মুখ বাঁকালেন তিনি, 'কী যে বলেন, মি. পার্কম্যান! ওই লোকগুলোর সাথে কিছুতেই নয়। আপনি আর মি. অ্যাডামস শ হলেন যথার্থ ভদ্রলোক, দেখলেই বোঝা যায়। তো আপনারা কী বলেন? একতাই বল, জানেন তো?'



হেনরি শ্যাটিলন

কুইন্সির দিকে ফিরলাম। 'তোমার কী মত?' 'আমার যেতে আপত্তি নেই,' জবাব দিল সে। 'চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন 'তা হলে ওই কথাই রইল!' পশ্চিমে যেতে কোন রাস্তা ধরব সিদ্ধান্ত হলো। আমাদের পুরো প্রস্তুতি নেয়া হয় নি বলে নতুন বন্ধুদের কথা দিলাম কানসাস ক্রসিংয়ে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। ওরা সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

আমরা ঘোড়া এবং খচ্চর কিনলাম। এদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেয়া



এমন সময় শুরু হলো প্রেইরির কুখ্যাত ঝড়-বৃষ্টি

হলো ডেসলরিয়ের্স নামের হাসিখুশি এক কানাডিয়ানকে। আমাদের ছোট দলটির চতুর্থ সদস্য হলো এক ফরাসি। তাকে সেন্ট লুইস থেকে নিয়ে এসেছিলাম গাইড হিসেবে। তার নাম হেনরী শ্যাতিলন। পাক্কা ছয় ফুট লম্বা, শক্তিশালী, দক্ষ এক শিকারি'। তার জীবনের ত্রিশ বছরের অর্ধেকটাই কাটিয়েছে পাহাড় পর্বতে। শোনা যায়, সে নাকি প্রতি বছর গড়ে একটিরও বেশি ভালুক শিকার করেছে। আমি হেনরী শ্যাতিলনের

মতো দুঃসাহসিক আর হৃদয়বান মানুষ এর আগে দেখিনি।

আমরা আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছি, এমন সময় শুরু হলো প্রেইরীর কুখ্যাত ঝড়-বৃষ্টি। আকাশ চিরে সাপের জিভের মতো ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, তার পরই কানফাটানো বজ্রের সঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি; এমনটা আর কখনও কোথাও দেখিনি। যদিও এই সফর শেষ হবার আগেই এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠব আমরা। বৃষ্টির তোড়ে ফুলে উঠল নদী। খরস্রোতা সে নদী পার হতে জান বেরিয়ে গেল আমাদের। সন্ধ্যা নাগাদ থেমে গেল ঝড়ের তাণ্ডব। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ, এমন সময় ক্যাপ্টেন সি-র কাছ থেকে চিঠি পেলাম। 'কুইন্সি', বললাম আমি, 'ওরা কানসাস ক্রসিং নয়, ফোর্ট লিভেনওয়ার্থে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন। মনে হচ্ছে ওরা ধরে নিয়েছে, আমরা অভিবাসীদের কাছে পৌছতে সামরিক বাহিনীর একটা ট্রেইল ধরে এগুব।'

'কিন্তু ফ্রান্সিস', রেগে গেল কুইন্সি, 'এরকম তো কথা ছিল না। ওরা আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই রাস্তা বদলাল কেন?'

'কাজটা ভালো করেনি ওরা,' সায় দিলাম আমি, 'তবে এখন আর কিছু করার নেই। ফোর্ট লিভেনওয়ার্থেই যেতে হবে।'

মে-র এক সুন্দর সকালে চার জনের দলটি আটটি প্রাণীসহ যাত্রা শুরু করলাম। ধূসর ইন্ডিয়ান টাট্টু ঘোড়াটায় চেপে হেনরী শ্যাতিলন চলল সবার আগে আগে। তার পরনে সাদা কম্বলের কোট, মাথায় চওড়া ফেল্ট হ্যাট এবং পায়ে মোকাসিন, এক কোমরে ছুরি বাঁধা, আরেক কোমরে ঝুলছে বুলেটভর্তি থলে, স্যাডলের সামনে বেঁধে রেখেছে রাইফেল। আমরা শ্যাতিলনের পেছন পেছন এগোচ্ছি। আমাদের পেছনে ডেসলরিয়ার্স। সে খচ্চর আর গাড়ি সামাল দিচ্ছে। গোড়ালি-ডোবা কাদার ওপর শক্ত করে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে সে। পাইপ টানছে, আর কিছুক্ষণ পরপর বেয়ারা খচ্চরগুলোর গুষ্টি উদ্ধার করছে গালিগালাজের ঠেলায়।



মে-র এক সুন্দর সকালে যাত্রা শুরু করলাম

শুরুটা তেমন ভাল হলো না। গাড়ির সঙ্গে জোঁতা খচ্চর প্রথমে গোঁ ধরে থাকল, কিছুতেই টানবে না গাড়ি। ক্রমাগত পিছু হটে দৌড়াদৌড়ি আর বাঁধন টেনে-হিঁচড়ে সে গাড়িটাকে প্রায় মিসৌরীর পানিতেই ফেলে দিচ্ছিল। আমরা ওয়েস্টপোর্টের কাছাকাছি পৌঁছতেই, একটা গভীর খাদ পার হতে গিয়ে গাড়ি আটকে গেল কাদায়— এটা প্রেইরীর আরেকটা নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা, যা পরে আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কাদার



আমরা খোলা আকাশের নিচে রাত্রিযাপন করলাম

বাঁধন থেকে মুক্ত হতে ঝাড়া এক ঘণ্টা লাগল।

শুকনো জ.মিনে এসে চারদিকে চোখ বুলালাম। পেছনে সেই মহাবনভূমি, একদা যা পশ্চিম সমভূমি থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সামনে সবুজ সাগরের মতো প্রেইরী, যেন দিগন্তরেখায় মিলেছে।

সে রাতে আমরা তাঁবু গাড়লাম কানসাস নদীর তীরে এক তৃণভূমিতে।

তৃণভূমিতে একটি গাছও নেই। জানোয়ারগুলো যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য রশি দিয়ে সামনের পাগুলো ভালমতো বেঁধে দিলাম। ডেসলাউরিয়ার্স ঘুমাল গাড়িতে, আমরা তিন জন মাটিতে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। ঘোড়ার জিন হলো আমাদের মাথার বালিশ। এই প্রথম আমরা খোলা আকাশের নিচে রাত্রিযাপন করলাম।



আগুন জ্বালিয়ে কুণ্ডলীর পাশে বসলাম আমরা

২. ঝাঁপিয়ে পড়া

আরও দেড় দিন লেগে গেল ফোর্ট-লিভেনওয়ার্থে পৌছতে। কাছেই তাঁবু গেড়েছেন আমাদের ব্রিটিশ সহযাত্রীরা। রাতের খাবারপর্ব শেষ করে প্রেইরীর ঘাসের চাপড়ায় আগুন জ্বালিয়ে কুণ্ডলীর চারপাশে ঘিরে বসলাম আমরা।

জানলাম মি. আর নামের একজন ইংরেজ ওয়েস্ট পোর্টে তাদের দলের নেতৃত্ব নিয়েছেন। তিনি এমন কিছু কথা বললেন, যা শুনে রীতিমতো রাগ ধরে গেল আমাদের।

'আপনি কী বলতে চাইছেন,' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে, 'সবাই যে রাস্তায় চলতে রাজি ছিল, সেই রাস্তাটা আপনি কারও সাথে আলাপ না করেই পাল্টে ফেলেছেন, আর আপনাদের কেউই সেই রাস্তাটা আদৌ চেনে না?'

"আস্তে, আস্তে, পার্কম্যান,' নরম গলায় বললেন আর, 'অবাক হবার মতো কিছু হয়নি। গত গ্রীষ্মে অশ্বারোহী সৈনিকরা ফোর্ট লারামি যাওয়ার জন্য যে পথে গিয়েছিল, আমরা সেটা ধরে এগুব। ওই রাস্তা আমাদের নিয়ে যাবে প্লাট নদীতে। সেখান থেকে অরিগন অভিবাসীদের পথচিহ্ন অনুসরণ করা সহজ হবে। আমরা পরশু দিনই 'ঝাঁপিয়ে পড়তে' চাই।"

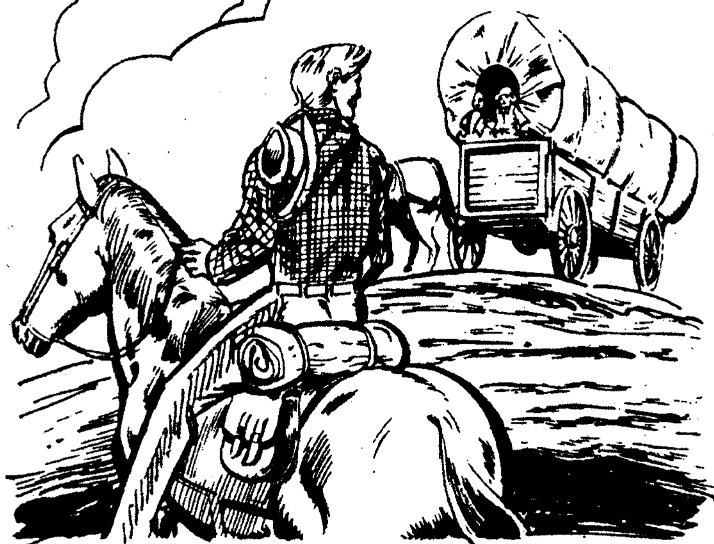
কিন্তু আমি এবং কুইন্সি মি. আর-এর পরামর্শে খুশি হতে পারলাম না। পরদিন ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ থেকে মাইল কয়েক দূরে কিকাপু ইন্ডিয়ানদের গ্রামে গেলাম এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে হালকা খাবার খেয়ে বিদায় নিলাম।

পরদিন সূর্যোদয় নাগাদ সবাই প্রস্তুত হয়ে 'ঝাঁপিয়ে পড়লাম'। ঘোড়ার গাড়িতে সবার আগে আগে চলেছি আমি, পেছন ফিরে দেখলাম মাইলখানেকজুড়ে ঘোড়সওয়াররা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। একদম শেষে একটি সাদা গাড়িতে আছে আমাদের ইংরেজ সঙ্গীরা। ছয়টি খচ্চর টানছে গাড়িটা, ওতে ছয় মাসের রসদ আছে, আর গোলাবারুদ যা আছে তা আস্ত একটা বাহিনীর জন্য যথেষ্ট।

কুইন্সি আর আমি এখনও মি. আর-এর নির্দেশিত পথে চলতে অস্বস্তিবোধ করছি।

ঘণ্টা দেড়-দুই যাওয়ার পরে কতগুলো পরিচিত লোক দেখতে পেলাম সামনে। 'এই যে ভাই,' বলল একটি কণ্ঠ, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

সেই কিকাপু ব্যবসায়ী। আমরা ততক্ষণে মাইলকে মাইল রাস্তা পাড়ি



সাদা গাড়িটিতে আছে আমাদের ইংরেজ সঙ্গীরা

দিয়েছি, অথচ রকি পর্বতমালার দিকে এগোতে পারি নি এক ইঞ্চিও। কাজেই কিকাপু ইন্ডিয়ানের দেখানো পথের দিকে ঘুরে আমি আর কুইন্সি পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করলাম।

আমরা সমভূমির মাঝ দিয়ে এগোতে লাগলাম তখন সূর্যই ছিল আমাদের পথনির্দেশক। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে এগোচ্ছি। ছোট কয়েকটি নদী পায়ে



আমরা নতুন রাস্তা ধরে এগোলাম

হেঁটে পার হয়ে দেখলাম আমাদের সামনে মাইলের পর মাইল সবুজ প্রেইরী।

'এই যে এসে পড়েছি!' মাটিতে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। আমরা এতখানি ঘোরাপথে এসে বেজায় ক্লান্ত, মেজাজও যথেষ্ট খারাপ ছিল। মেজাজ কিছুটা ঠাণ্ডা হলে আমরা নতুন রাস্তা ধরে এগুলাম।

পরদিন সকালে নতুন পথ আমাদের পৌঁছে দিল বেশ চওড়া এবং গভীর একটা প্রবাহের কাছে। জায়গাটা কাদায় ভর্তি। ডেসলরিয়ারস গাড়ি নিয়ে চলছিল সামনে। সে মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে খচ্চরের পিঠে কষাতে থাকল চাবুক, ফরাসি ভাষায় বাছাই করা শাপ-শাপান্তের বহর ছোটাল।



লাফ মেরে সে নেমে আরও জোরে চাবুক আর গালাগালির তুবড়ি ছোটাল

নদীর দিকে ছুটল গাড়ি। অর্ধেকটা নদী পার হয়েই কাদায় আটকে গেল চাকা। লাফ মেরে নদীতে নামল সে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়া কাদায় নেমে আরও জোরে চাবুক আর গালাগালির তুবড়ি ছোটাল, অবশেষে কাদা থেকে গাড়ি তোলা সম্ভব হলো।

আমাদের ইংরেজ বন্ধুদের লম্বা দল তাদের ভারী ওয়াগন নিয়ে হাজির হয়ে গেল নদীর তীরে। ওদের পশুচালক রাইট দাঁড়িয়ে গেল।

'আমার পরামর্শ হচ্ছে...' শুরু করতে গেলেন ক্যাপ্টেন।



মালের ভারে প্রতি মুহূর্তেই বেশি করে কাদায় দেবে যাচ্ছিল গাড়িটা

'গাড়ি চালাও!' চেঁচালেন আর।

কিন্তু রাইট তখনও সিদ্ধান্ত স্থির করেনি। সে একটা খচ্চরের পিঠে বসে আপন মনে শিস বাজাতে লাগল। 'আমার পরামর্শ হচ্ছে,' বলে গেলেন ক্যাপ্টেন, 'গাড়ি থেকে মালপত্র সরাতে হবে, নইলে নির্ঘাত কাদায় আটকে যাব।'

'গাড়ি চালাও! গাড়ি চালাও!' অধৈর্য ভঙ্গিতে চেঁচালেন মি. আর।

রাইট হঠাৎ তার ছয় খচ্চরকে চাবকাতে শুরু করল, সেই সঙ্গে মুখ থেকে নিঃসৃত হলো এমন মার্কিন গালি আর শপথের কামানবর্ষণ, যার কাছে

ডেসলিউর আগেকার ফরাসি গালিগালাজকে মনে হলো নিছক পটকাবাজি। কাদার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল খচ্চরের দল। ওরা অপরপ্রান্তে না পৌঁছনো পর্যন্ত উন্মাদের মতো গালিবর্ষণ চালিয়ে গেল রাইট। গাড়িটার বেলায় অবশ্য জান ছুটে গেল সবার। কারণ মালের ভারে প্রতি মুহূর্তেই বেশি করে কাদায় দেবে যাচ্ছিল ওটা। অবশেষে গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে কাদা খুঁড়ে চাকাগুলোকে বের করে ওটাকে ওপারে তোলা গেল।

দুই সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন চার-পাঁচ বার করে এরকম আকস্মিক বিপদে পড়তে হলো, ফলে আমাদের যাত্রার গতি স্বাভাবিকভাবেই শ্লথ হয়ে গেল।

সবুজ ঘাসে ঢাকা সমভূমির দৃশ্যপট সত্যি মনোমুগ্ধকর। তবে এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে গেলে অভিযাত্রী হয়তো আবিষ্কার করবে কাদায় তার গাড়ির চাকা আটকে গেছে, ঘোড়ার রাশ আলগা হয়ে গেছে বা এমনিতর আরও কিছু। কিন্তু বিছানা হতো সত্যিকারের কোমল-কৃষ্ণ, নরম কাদার ওপর।

আমাদের খাওয়া বলতে শুধু বিস্কিট আর লবণ মেশানো শুকনো মাংস। অদ্ভুত লাগলেও এখানে শিকার করার মতো প্রাণী ছিল খুবই কম। এখানে ঘাসের মধ্যে হরিণের চিমসানো শিং বা মোষের সাদাটে খুলি ছাড়া অভিযাত্রীরা কিছুই দেখতে পাবে না। এই বিশাল পরিত্যক্ত ভূমিতে একদা ওগুলো চড়ে বেড়াত।

এদিকে অবশ্য বিরক্তিকর প্রাণীর সংখ্যা অগণিত। নীরবতা ভেঙে যায় নেকড়ের সংগীতে, দিনের বেলাতেও রাইফেলের সীমার ঠিক বাইরে এদের দেখা যায়। সাবধানে না চললে ব্যাজারের গর্তে ঘোড়ার পা ভাঙারও সম্ভাবনা যথেষ্ট। জলা এবং কাদায় ভরা পুকুরে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডেকে চলেছে হাজার হাজার ব্যাঙ। সাপেরাও ঘোড়ার পায়ের কাছ দিয়ে পিছলে চলে যাবে, এমনকি রাতে তাঁবুর ভেতরেও নীরবে দেখা দিতে পারে। আর চোখ থেকে ঘুমও হারাম করার জন্য লাখ লাখ মশার ঐকতানই যথেষ্ট।



এখানে মোষের সাদাটে খুলি ছাড়া অভিযাত্রীরা কিছুই দেখতে পাবে না

চাঁদিফাটা গরমে দীর্ঘযাত্রা শেষে তৃষ্ণার্ত ভ্রমণকারী যখন পুকুর থেকে ঠাণ্ডা পানি তুলে নেয়, আঁতকে উঠে দেখে গ্লাসের তলায় কিলবিল করছে ব্যাঙাচি।

প্রেইরীর নির্দয় সূর্য সারা দিন অসহ্য তাপে পোড়ায় ভ্রমণকারীকে। আর বিকেল চারটার দিকে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি।

এই হলো প্রেইরীতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা!

একদিন ঘটনাক্রমে ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ থেকে আসা চার সৈনিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে কথা বলার পরে লক্ষ করলাম, চোখ-মুখ



আঁতকে উঠে দেখে ঘাসের তলায় কিলবিল করছে ব্যাঙাচি

লাল হয়ে গেছে কুইন্সির, সূর্যের উত্তাপে যে হয় নি বোঝা যাচ্ছিল।

'জাহান্নামে যাক ব্যাটা আর-!' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল সে, 'আবার ভুল পথে হাঁটছি আমরা।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'এরা কী বলেছে?'

বলল 'ট্রেইলের উল্টোপথে যাচ্ছি আমরা! প্লাট নদীর পরিবর্তে আইওয়া



অরিগনে যাওয়ার ট্রেইলই খুঁজে পেলাম না এখনও

ইন্ডিয়ানদের গ্রামের দিকে চলেছি। ওদিকে প্লাট নদীর চিহ্নও নেই, ব্যাটা আর– !'

একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলতে লাগল কুইন্সি, 'সৈনিকরা পরামর্শ দিল উত্তর পাশে চলতে যতক্ষণ না সেন্ট জোসেফস ট্রেইলে পৌঁছি। অরিগনের কিছু অভিবাসী সপ্তাহ কয়েক আগে ওই ট্রেইল ব্যবহার করেছে। ওদিক দিয়ে গেলে পশ্চিমে মূল অরিগন ট্রেইলে পৌঁছতে পারব।'

এতখানি রাস্তা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পাড়ি দেয়ার পরে এ কথা শুনে মেজাজ যে খারাপ হলো, তা বলার নয়! অরিগনে যাওয়ার ট্রেইলই খুঁজে পেলাম না এখনও। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে ওখানে পৌঁছতে।

পরদিন সেন্ট জোসেফসের ট্রেইলে পৌঁছলাম আমরা। অভিবাসীদের অসংখ্য পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। পশ্চিম অভিমুখে ঘোড়া ছোটালাম, ফোর্ট লারামির দিকে মুখ করে। ৭০০ মাইল রাস্তা পেরুতে হবে, অবশ্য আবার যদি পথ না হারিয়ে ফেলি!



ঘষা কাচের মতো উত্তপ্ত সূর্য সারাদিন পুড়িয়ে চলল বিরামহীন

৩. প্লাটের পথে

ভয়ানক একঘেয়ে এক যাত্রা শুরু করেছি আমরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাজা ঘাসের কার্পেট মাড়িয়ে চলেছি, একটা ঝোপ কিংবা গাছও চোখে পড়ল না। মাঝেমধ্যে একটা কাক কিংবা দাঁড়কাক অথবা একটা চিলের ডাক একটু করে নীরবতা ভেঙে দিয়ে যায়।



তাঁবুর ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ধারা আমাদেরকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাকভেজা করে দিল

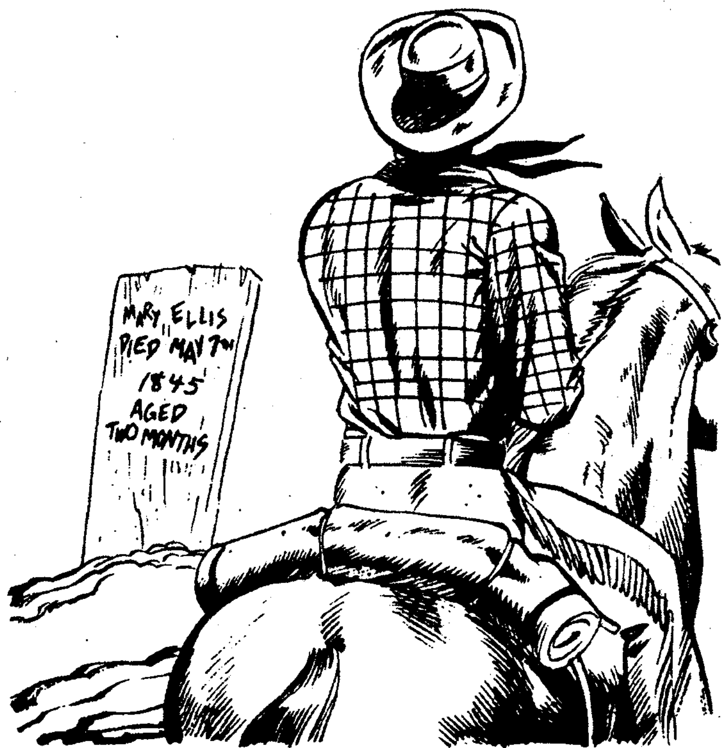
আবহাওয়ারও কোন পরিবর্তন নেই। ঘষা কাচের মতো উত্তপ্ত সূর্য সারা দিন পুড়িয়ে চলল বিরামহীন। সন্ধ্যার দিকে দিগন্তে ছুটোছুটি শুরু হয় ঝড়ো মেঘের। দূর থেকে গুরু গুরু শব্দে হুংকার ছাড়ে বজ্র, প্রেইরীর বুকে গড়িয়ে গড়িয়ে এল সে আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা চরাচর ঢেকে গেল কালি-গোলা ছায়ায়। অকস্মাৎ মেঘে ঢাকা আকাশের বুক চিরে দিল



হেনরি শ্যাতিলন বড়সড় একটি ভেলা বানিয়ে ফেলল

সাপের জিভের মতো লকলকে বিদ্যুৎ। পরপরই মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল বজ্রের উচ্চ নিনাদে।

আমরা দ্রুত ঘোড়াগুলোর পা রশি দিয়ে বেঁধে তাবু খাড়া করলাম, সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি। তাঁবুর ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ধারা আমাদেরকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাকভেজা করে দিল। টুপির কিনার বেয়ে ঝরছে পানি, গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। রীতিমতো গোসল হয়ে গেল। আমাদের তাঁবুর খুঁটির ধারে সৃষ্টি হলো ছোট ছোট ডোবা, মেঝে ভেসে যাওয়ার উপক্রম।



অভিবাসীদের কবর

ঠিক আমাদের মাথার ওপরে যেন বজ্রপাতের শব্দ হলো। আটলান্টিক উপকূলের নিরীহ, সাদামাটা বজ্রপাত এ নয়। বজ্রের শব্দ গোটা আকাশজুড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। সারা রাত ধরে চমকাল বিদ্যুৎ, সেকেণ্ডের জন্য আলোকিত করে তুলল গোটা উপত্যকা, পরমুহূর্তেই নিরেট অন্ধকারের দেয়ালে বন্দি হয়ে গেলাম আমরা।

মাটি আর কম্বলের মাঝখানে রাবারের চাদর পেতে দিলাম। রাবার কিছুক্ষণের জন্য মেঝের পানি ঠেকিয়ে রাখল। তবে একটু পরেই কিনারা উপচে পড়তে লাগল। বৃষ্টির পানির পুকুরের মধ্যেই ঘুমাতে হলো আমাদের।

সকালে যখন তাঁবু তুলে নিলাম, অন্তত ছয় ইঞ্চি কাদা থকথক করছে গোটা উপত্যকাজুড়ে।

কিছুদিন পরে ব্লু রিভারের ধারে চলে এলাম আমরা। বৃষ্টির পানিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে নদী, আরও গভীর এবং স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেছে। হেনরী শ্যাতিলন বড়সড় একটি ভেলা বানিয়ে ফেলল। ওয়াগন থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেললাম, জিনিসগুলো স্তূপ করা হলো ভেলায়, আমরা চার জন ভেলার চারটা কোনা ধরে সাঁতরাতে লাগলাম। এরপর খালি ওয়াগন নিয়ে সহজেই পার হলাম নদী। তারপর যে যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম।

আট দিন পরে সেন্ট জোসেফস ট্রেইল যেখানে মূল অরিগন ট্রেইলের সাথে মিশেছে, সেখানে তাঁবু গাড়লাম। গত আট দিনে একটি মানুষও চোখে পড়েনি শুধু অভিবাসীদের চলাচলের কিছু বিষণ্ন চিহ্ন ছাড়া। কখনও পার হয়ে এসেছি এমন সব কবর, যাতে শুয়ে আছে অভিবাসীদের কেউ, পথ চলতে গিয়ে যে অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে, তাদেরকে রাস্তার ধারেই সমাহিত করা হয়েছে। তবে মাটির কবরগুলোতে খোঁড়াখুঁড়ি আর নেকড়ের পায়ের ছাপ স্পষ্ট। কখনও ঘাসে মোড়া পাহাড়ে দেখেছি কবর, সেখানে হয়তো পেটা লোহার পাতে খোদাই করা এমন কিছু কথা, 'মেরি এলিস, মৃত্যু ৭ মে, ১৮৪৫, দুই মাস বয়স।'

ভাবুন তবে আমাদের ওপর এর বিষণ্ন প্রভাব! সন্ধ্যায় আগুন জ্বালিয়ে নিঃশব্দ প্রেইরীতে চুপচাপ বসে থাকলাম আমরা, দূর থেকে যেন নারী আর পুরুষের আবছা কণ্ঠ ভেসে আসছে।

পরদিন সকালে যে অভিবাসীদের আমরা অনুসরণ করছিলাম, তাদের ক্যারাভানের দেখা পাওয়া গেল। ক্যারাভানে গোটা কুড়ি গাড়ি, সাদা পর্দায় মোড়া। ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে। পেছনে গৃহপালিত পশুর বিশাল পাল।

আমরা ওদের কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল কতগুলো বাচ্চা। তাদের মায়েরা উল বুনতে ব্যস্ত, কৌতূহল নিয়ে দেখল আমাদেরকে।



অভিবাসীদের ক্যারাভানে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে

প্রতিটি গাড়ির পাশে হাঁটছে স্বামীরা, তাগাদা দিচ্ছে বলদগুলোকে। ওদের কেউ কেউ আমাদেরকে রীতিমতো ঈর্ষা নিয়ে দেখল, ঘোড়ার পিঠে আমাদের নবাবের মতো এগিয়ে চলা দেখে!

শিগগিরই ওদের আমরা অনেক পেছনে ফেলে এলাম। কিন্তু আমাদের ইংরেজ সঙ্গীর গাড়ি গভীর এক কাদার গর্তে আটকা পড়ে গেল। কাদার কবল থেকে যখন মুক্তি মিলল ততক্ষণে ওয়াগন ট্রেনটি চলে গেছে পাশ কাটিয়ে।

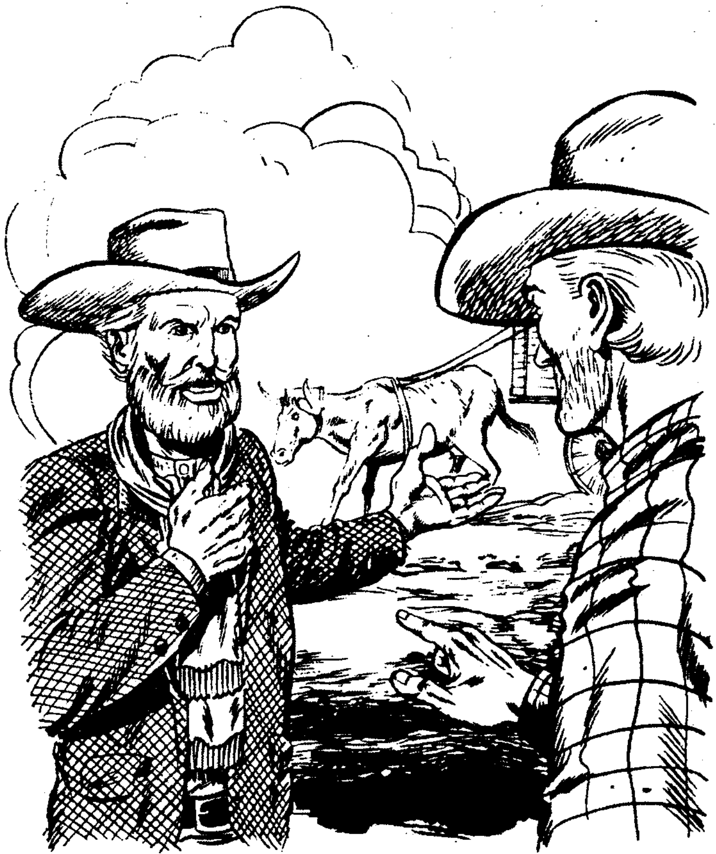


আর-কে দেখা গেল ঘোড়া নিয়ে অভিবাসীদের কাছে যেতে

কিন্তু অভিবাসীরা খানিক পরই ক্যাম্প খাটাল, আমরা আবার তাদের ছাড়িয়ে অনেকদূর গিয়ে বিশ্রাম নিতে থামলাম। খেতে বসে দেখি মি. আর অনুপস্থিত। কুইন্সিকে জানালাম ব্যাপারটা।

'ক্যাপ্টেন বলেছেন মি. আর অভিবাসীদের কাছে গেছে তার ঘোড়ার নাল ঠিক করার জন্য,' জানাল কুইন্সি।

ব্যাপারটা ভাল লাগল না আমার। 'কিন্তু কুইন্সি, তার তো এতক্ষণে ফিরে আসার কথা... অবশ্য যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে থাকে।'



'ঠিকই বলেছ ফ্রান্সিস, আমি... দেখো!' কুইন্সি মাইলখানেক দূরের একটা পাহাড়চুড়োর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। আর-কে দেখা গেল ঘোড়া নিয়ে আসছে। সঙ্গে মস্ত সাদা কী যেন একটা।

'মাথামোটাটা আবার সঙ্গে কী নিয়ে এল?' বিড়বিড় করলাম আমি। একটু পরেই জবাব পেয়ে গেলাম। চারটে বলদ টেনে আনছে একটি গাড়ি, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একসময় ওটা আমাদের ক্যাম্পের দিকে এগুতে লাগল।



মুখোমুখি হয়ে যাই একদল পনির

শুনলাম অভিবাসীদের কেউ ফিরে যেতে চাইছে, অন্যরা সামনে এগোতে চাইছে। আরেক দল পথে অপেক্ষা করতে চাইছে যাতে ব্লু রিভারের ওপারে সন্তান জন্ম দেবার জন্য যাদের পেছনে ফেলে আসা হয়েছিল, তারা চলে আসতে পারে। চারটা গাড়ি এগিয়ে যেতে চাইছিল, ওখানে দশজন পুরুষ, একজন নারী, একটি ছোট শিশু। এদেরকে আর নিয়ে এসেছেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। আমরা ওদেরকে দলে নিতে মানা

করতে পারলাম না। কারণ এই বিজন ভূমিতে ইন্ডিয়ানদের হামলার ভয় আছে। ওদের নেতা কিয়ার্সলিকে বললাম, 'আমরা কিন্তু দেরি করতে পারব না। আপনাদের বলদগুলো আমাদের খচ্চরদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে কিন্তু আপনারা পেছনে পড়ে থাকবেন।'

'মি. পার্কম্যান,' বলল কিয়ার্সলি, 'আমাদের বলদ আপনাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে, না পারলে সে ব্যবস্থা আমি করব।'

পরদিন ঘটল একটি দুর্ঘটনা। আমাদের ইংরেজ সঙ্গীদের গাড়ির অক্ষদণ্ড গেল ভেঙে। কিয়ার্সলির বহর ধীর গতিতে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, ওদের ধরতে আমাদের পুরো এক সপ্তাহ লাগল!

আমরা এখন পনি ইন্ডিয়ানদের এলাকায় চলে এসেছি। এরা খুনে ও লুটেরা; শত্রুর খুলির চামড়া সংগ্রহ এদের কাছে বীরত্বের স্মারক। প্রতি বসন্তে পনিরা তাদের স্থায়ী নিবাস প্লাট নদীর নিচু অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণে, উদ্দেশ্য যুদ্ধ এবং শিকার। আমাদের পশুপাল আর মাথার চামড়া এদের উদ্দীপ্ত করার জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কাজেই আমরা প্রতি রাতে পালা করে পাহারা দিয়ে ঘুমাবার ব্যবস্থা করলাম।

পনিদের রোমহর্ষক এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা কিয়ার্সলির দলের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে জানতামই না। যে সপ্তাহে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, তখনই তাদের সঙ্গে কিছু পনির মোলাকাত হয়েছে। কিয়ার্সলি জানাল, 'আমাদের মাংস ফুরিয়ে আসছিল। তাই কতগুলো কালো ফুটকিকে নড়াচড়া করতে দেখে মোষ ভেবে আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমাদের কেউই আগে মোষ দেখেনি, কিন্তু তাতে কী যায় আসে। কাজেই কয়েকজন রাইফেল বাগিয়ে কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে, বাকিরা পায়ে হেঁটে শিকারে গেলাম।

'আধ ঘণ্টা পরে ঘাসে ছাওয়া এই পাহাড়ের ঢালে উঠে আসতেই মুখোমুখি হয়ে যাই একদল পনির। আমাদের দশ জনের বিরুদ্ধে ওরা ত্রিশ জন। তবে আমাদের হাতে বন্দুক ছিল আর পনিদের কাছে ছিল তীর-ধনুক। ওদেরকে দেখে আমরা যতটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ওরাও



মাইলের পর মাইল নিঃসঙ্গ হ্রদের মতো বিস্তৃত সমতল ভূমি

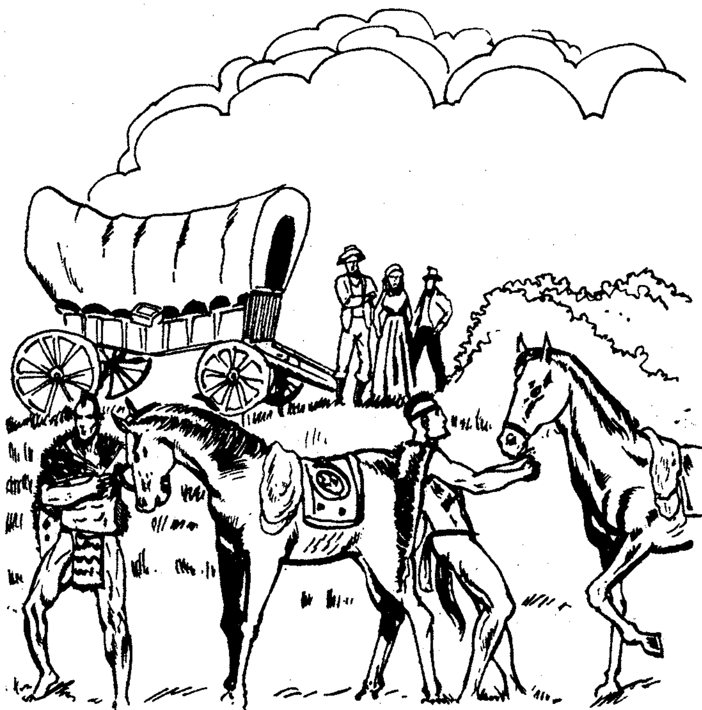
তার চেয়ে কম ঘাবড়ায়নি। তাই ওরা হামলার চেষ্টা না করে এমন ঝাঁকুনি দিয়ে হাত মেলাল, যে ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে তা বিরল। আমরাও অবশ্য খুলির চামড়াসমেত নিরাপদে ফেরত যেতে পেরেই খুশি হলাম।'

অভিবাসীদের সাথে পুনরায় মিলিত হবার দিনটিতেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্লাট নদীর উপত্যকা দেখলাম। তবে দৃশ্যটা যতই আকাঙ্ক্ষিত হোক, এবে সুন্দর বলা কঠিন। মাইলের পর মাইল নিঃসঙ্গ হ্রদের মতো বিস্তৃত সমতল ভূমি। এটাকে এখানে-সেখানে দিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় চিরে ফিতের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে প্লাট নদী। আবার মাঝখানে কোথাও কোথাও ছায়াঘেরা দ্বীপের মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে জঙ্গল। এই বিশাল চরাচরে কেবল বালিয়াড়ি আর ঘাসের আড়ালে ছোটাছুটি করা গিরগিটি ছাড়া জ্যান্ত আর কিছুই চোখে পড়ল না।



মহিষের সাদা হাড় এবং খুলি সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো

ফোর্টলারামি এখনও চারশ মাইল দূরে– তিন সপ্তাহের পথ। রকি পর্বতমালায় পৌঁছতে আমাদেরকে বালুময় লম্বা একটা সমভূমি পাড়ি দিতে হবে। জমিনের দু পাশে সারিসারি বালুর পাহাড়, ভেঙেচুরে বুনো আর আজব গড়ন দাঁড়িয়েছে একেকটির। বালুর পাহাড় ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে শত শত মাইলব্যাপী এক পদচিহ্নশূন্য বিরান ভূমি। এই জমিনের একদিকে আরকানসাস নদী, অন্যদিকে মিসিসিপি-মিসৌরী। আমাদের সামনে এবং পেছনে, যত দূরে দৃষ্টি যায় ধূ ধূ সমভূমি। কড়া রোদে ঝকঝক করছে বালিয়াড়ি। আবার জমিনের কোথাও কোথাও লম্বা, মোটা ঘাসে ঢাকা। মহিষের সাদা হাড় এবং খুলি সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো।



একদল বুনো মানুষকে দেখলাম আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছে

প্লাটে পৌঁছুবার পরের দিন একদল বুনো মানুষকে দেখলাম আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হতশ্রী, ক্লান্ত চেহারা। পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে। ঘোড়া আছে সবার সঙ্গে। কিন্তু কেউ ঘোড়ার পিঠে চড়ে নি। তাদের পরনে লেংটির মতো কাপড়, কাঁধ থেকে ঝুলছে মোষের চামড়ার জোব্বা। হাতে তীর-ধনুক। ঘোড়ার পিঠে মোষের মাংস, ওদের শিকারের ফসল আর বেঁচে থাকার উপাদান।

এই বুনোরা হলো পনি যাদের সাথে আমাদের পুনর্মিলনের আগে কিয়ার্সলির মোলাকাত হয়েছিল। প্রেইরীর অসভ্যদের মাঝে এই পনিদেরই প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম যদিও সেটা তেমন অভিভূত হবার মতো হলো না।

পরে শুনেছি এই পনিরা এর আগে একদল অভিবাসীর ওপর হামলা চালিয়েছে, তবুও দলটির সর্দারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ বাক্যালাপ হলো। আমি সর্দারকে আধা পাউন্ড তামাক দিলাম। উপহার পেয়ে সে মহা খুশি।

ওরা চলে যাবার পরে কুইন্সি বলল, 'বিষয়টা এভাবে দেখো, ফ্রান্সিস, ওদের আচরণ বন্ধুর মতো মনে হলেও কিয়ার্সলির দলের সাথে আছি বলে বরং মহা স্বস্তি বোধ করছি, হাজার হোক দশ জনের সাথে থাকলে ঘন ঘন পিঠটাকে পাহারা দিতে হয় না।'



এদিকে যে গত বছরও মহিষের বিচরণ ছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র

৪. মোষ!

প্লাট-এ চারদিন কেটে গেল অথচ এখনও কোন মোষ চোখে পড়ল না!

এদিকে যে গত বছরও মহিষের বিচরণ ছিল তার ভূরিভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। মাটিতে জানোয়ারগুলোর পায়ের ছাপ আর গরমের দিনে ধুলোয় গড়াগড়ি দেবার ফলে মাটিতে টোল খাওয়ার দাগ অস্পষ্ট। আরও

রয়েছে শুকনো গোবর। শুকিয়ে খটখটে হয়ে থাকা এই গোবর জ্বালানি হিসেবে চমৎকার, যদিও পাওয়া যায় খুবই কম। কিন্তু স্বয়ং প্রাণীটারই দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না।

এক বিকেলে আমি এবং হেনরী শ্যাতিলন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাইল দুয়েক দূরে চলে এলাম অ্যান্টিলোপের খোঁজে। বিস্তৃত মাঠে বাতাসে দোল খাচ্ছে লম্বা সবুজ ঘাসের ডগা, যেন ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছে আমাদের ঘোড়ার পেট। হঠাৎ বাম দিকের বালিয়াড়ির দিকে হাত উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হেনরী। মাইল দুয়েক দূরে একজোড়া বিন্দু দেখা যাচ্ছে। একটি পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে ধীরগতিতে।

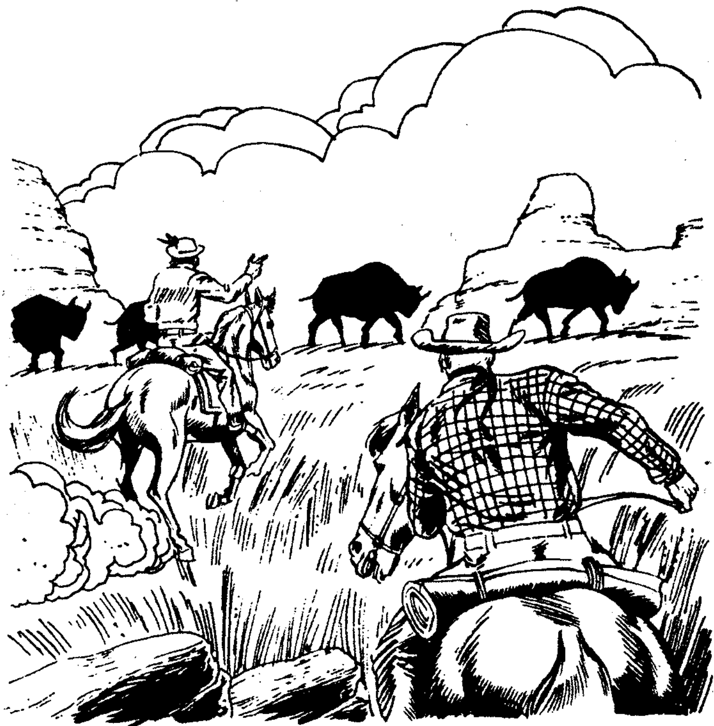
'মোষ! জলদি চলো!' ইন্ডিয়ান টাট্টুর পিঠে সজোরে চাবুক কষাল হেনরী।

একটা গিরিখাতের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমরা। পাহাড়ের মধ্যে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে গিরিখাতটি। ওটা এত গভীর যে আমাদের পুরোপুরি আড়াল করল তা। আমরা ঘোড়া নিয়ে গিরিখাতের মাথায় পৌঁছে গেলাম, লুকিয়ে পড়লাম ঝোপের আড়ালে। হঠাৎ লাগাম ধরে ঝাঁকুনি দিল হেনরী। আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল, 'ওই যে! দেখতে পাচ্ছো?'

ওর অঙ্গুলি নির্দেশ মাফিক সিকি মাইল দূরে নজর বোলালাম। এক পাল মোষ হেলেদুলে, রাজকীয় ভঙ্গিতে আসছে। আরেকটি পাহাড়ের খাদ থেকে আরও কয়েকটি মোষ এসে যোগ দিল প্রথমটির সঙ্গে। গিরিখাতের কাছে আবির্ভূত হলো জরাজীর্ণ চেহারার এক মোষ, খাটো শিংজোড়া ভাঙা। একের পর এক মোষ চোখের সামনে দৃশ্যমান হতে থাকল, শত্রুর অস্তিত্ব সম্পর্কে একদমই সচেতন না তারা।

ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল হেনরী। তার অস্ত্রের সঙ্গে আমার রাইফেলটিও নিয়েছে। আমি হেনরীর ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে তার কীর্তি দেখতে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে নজরের বাইরে চলে গেল হেনরী। মোষ পাল উপত্যকা ধরে ক্রমে এগিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ দু পক্ষই চুপচাপ থাকল।

হঠাৎ পরপর দু বার গুলির আওয়াজ হলো। মন্থর গতিতে চলা মোষ



মোষ! জলদি চলো!

পালের মধ্যে সৃষ্টি হলো চাঞ্চল্য, ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের ওধারে গিয়ে পালাল ওরা। সিধে হলো হেনরী, তাকিয়ে থাকল পলায়নপর দলটির দিকে।

'তুমি গুলি লাগাতে পার নি,' বললাম আমি।

'হু', বলল হেনরী। 'চলো,' সে গিরিখাতে নেমে এলো। রাইফেলে গুলি ভরল, চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে।

আমরা পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম মোষগুলোর খোঁজে। চুড়োয় এসেও পালটাকে দেখতে পেলাম না। তবে অদূরে, ঘাসের মধ্যে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে একটা মৃত মোষ। আরেকটার মরো মরো দশা।



শত্রুর অস্তিত্ব সম্পর্কে একদমই সচেতন না তারা

'দেখলে তো, কেমন গুলি লাগাতে পারি!' আনন্দে চিৎকার দিল হেনরী। হেনরী কমপক্ষে দেড়শ গজ দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছিল, দুটো বুলেটই জানোয়ারগুলোর ফুসফুস এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। মোষ শিকারের বেলায় এটাই শ্রেষ্ঠ শিকারির পরিচয়।

আঁধার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ঝড়ও আসছে। আমরা ঘোড়াগুলোকে মোষের শিংয়ের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। ঝড়ের মধ্যে আর ছুটে পালাতে পারবে না। হেনরী মোষের ছাল ছাড়াতে বসল। দক্ষ হাতে মাংস থেকে আলাদা করল চামড়া, আমি ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্টা করলাম। জিনের পেছনে ঝুলন্ত ফিতে দিয়ে বেঁধে নিলাম মাংস। মোষের সবচেয়ে ভাল



দেখলে তো কেমন গুলি লাগাতে পারি

মাংসটুকুর গুরুভার বোঝাটি ঘোড়াদুটোর ওপর চাপিয়ে যাত্রা শুরু করলাম তাঁবুর উদ্দেশে।

ঝড়ের সময় খুব দ্রুত ঘনিয়ে আসে আঁধার যদিও সূর্যাস্তের তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। হিমশীতল বৃষ্টির ফোঁটা আঘাত হানছে গায়ে। দেখলাম প্রেইরী ডগ-রা (কাঠবেড়ালির মতো একটি প্রাণী) নিজেদের তৈরি গর্তে ঢুকে গেল।



বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, হিমশীতল বৃষ্টির ফোঁটা আঘাত হানছে গায়ে।

টা'না এক ঘণ্টা ঘোড়া ছোটানোর পরে আমাদের তাঁবু চোখে পড়ল। বাতাসের তোড়ে তাঁবুর একটা পাশ ফুলে উঠেছে পালের মতো। মহিষের কাটা মাংস তাঁবুর বাইরে মাটিতে রাখলাম। কুইন্সি আমার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি উপহার দিল।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। ট্রেইল ধরে এগোচ্ছি, হঠাৎ এক লোক চেঁচিয়ে উঠল 'মোষ! মোষ!' বলে। তাকিয়ে দেখি কেবল একটা হাড্ডিসার বুড়ো

মোষ একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রেইরীতে।

'পাহাড়ের পেছনে আরও মোষ থাকতে পারে,' চেঁচিয়ে বললাম আমি, 'চলে এসো, কুইন্সি, হেনরী!'

ছয় মাইল রাস্তা পাড়ি দিলাম। জ্যান্ত প্রাণী বলতে শুধু চোখে পড়ল নেকড়ে, সাপ আর প্রেইরী ডগ। মোষের পেছনে ধাওয়া করার মতো অনুকূল অবস্থা ছিল না জমিনের। খাড়া পাহাড়, গভীর খানাখন্দ, মাঝে মাঝে গিরিখাত, যা পার হওয়া সহজ নয়। অবশেষে একপাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মোষ চোখে পড়ল। কয়েকটা একটা সবুজ ঢালে ঘাস খাচ্ছে, বাকিরা নিচে চওড়া একটা গর্তের ধারে ভিড় করেছে।

ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে পড়ে শান্তভাবে এগুলাম যাতে মোষগুলো আমাদেরকে খেয়াল না করে। তবে সতর্ক হয়ে গেল মোষের দল। পাহাড়ের ওপরের জানোয়ারগুলো ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে লাগল। নিচেরগুলো সব এক জোট হয়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে ছুটতে শুরু করল। পূর্ণগতিতে ওগুলোকে ধাওয়া করলাম আমরা।

মহিষের পাল ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের মুখের কাছে চলে এল ওরা, আতঙ্ক ও ভয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে। ওদের প্রায় পিঠের ওপর চলে এসেছি আমরা। জানোয়ারগুলোর খুরের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে ধুলোর সমুদ্র, আমাদের দম প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আমরা যত কাহিল হলাম, ওদের গতি ততই বৃদ্ধি পেল। আমাদের ঘোড়াগুলো এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত নয়। তারা বেজায় ভয় পেল। আমরা যতই পালের ভেতর ঢুকে পড়তে চাই, ওরাও ততই মরিয়া হয়ে পাশে থাকতে চায়।

মোষের পাল এবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছুটছে, একেকটি দল একেক দিকে। আমি একটা দলের পিছু নিলাম এবং শিগগিরই কুইন্সি আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। সে হয়তো আরেকটা দলকে ধাওয়া করেছে। আমার ঘোড়া পন্টিয়াক উন্মাদ হাতির মতো ঢাল বেয়ে উঠছে



অবশেষে একপাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মোষ চোখে পড়ল

আর নামছে, প্রেইরীর মাটিতে তার খুর হাতুড়ির শব্দ তুলছে। এই মুহূর্তে ঘোড়াটাকে মনে হলো মহিষের পালকে ধাওয়া করার উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছে, পরমুহূর্তেই আবার হয়তো আতঙ্কিত হয়ে পিছু হটছে সে।

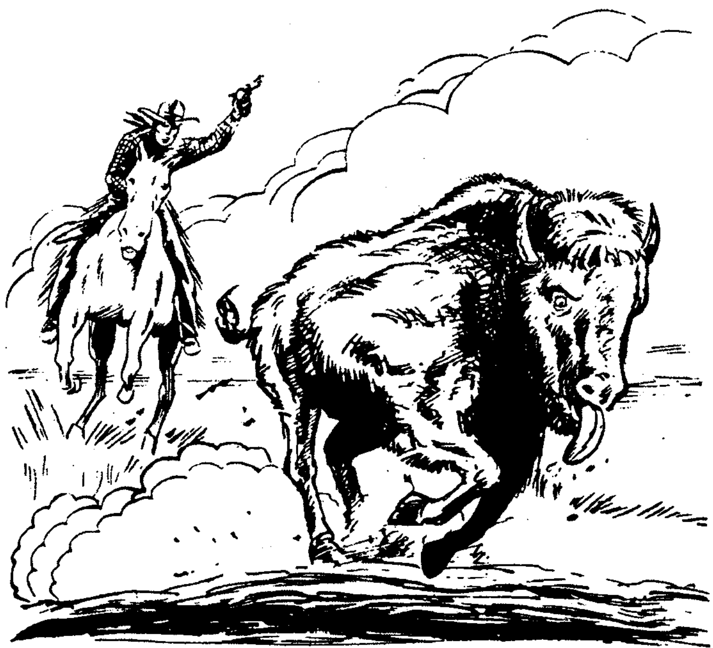
আমি একটা ষাঁড়ের পেছনে পন্টিয়াককে লাগিয়ে রাখলাম। মহিষের ঝাঁকড়া লোমশ শরীর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, গত শীতে ওটার গায়ে গজানো পশমের এবড়ো-খেবড়ো অবশেষও চোখে পড়ল। বাতাসে



আমি একদল মোষের পিছু নিলাম

উড়ছে সেই ছিন্নভিন্ন পশম। কিন্তু চাবুক কিংবা স্পার (জুতোয় লাগানো ধাতব কাঁটা, ঘোড়সওয়াররা সাধারণত ব্যবহার করে) কোনোটাই পন্টিয়াককে ওটার কাছে নিতে পারল না। শেষে উপায় না দেখে দূর থেকেই গুলি করলাম মোষটাকে।

লক্ষ্যস্থির ঠিকমতো না হওয়ায় মোষটাকে থামানো গেল না, কারণ এই দানবগুলোকে কয়েকটা বিশেষ স্থানে যুৎসই আঘাত করা না গেলে ওরা পালিয়ে যাবেই। যেমন এটা পালাল।



দূর থেকেই গুলি করলাম মোষটাকে

আরেকটা পাহাড়চুড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা। ধুলোর মেঘের আড়ালে ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেলাম ওদের খাটো লেজ এবং পা। কুইন্সি আর হেনরীর গলা শুনতে পেলাম। চিৎকার করে ডাকছে আমাকে। কিন্তু মোষ দেখে আতঙ্কিত পন্টিয়াকের রাশ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে সে। পন্টিয়াক মহিষের পালের মাঝ দিয়ে ছুটছে পূর্ণ গতিতে, মোষগুলোও ভয়ে ডানে-বামে দৌড়াতে লাগল।

দল থেকে পিছিয়ে পড়েছিল একটা ষাঁড়। আমি বহু কষ্টে পন্টিয়াককে ওটার সাত-আট গজের মধ্যে নিয়ে এলাম। মোষের শরীর ঘামে ভিজে জবজবে। হাঁপাচ্ছে বেদম, চোয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জিভ।

আমি এগিয়ে যেতে থাকলাম পাঁচটার দিকে, পন্টিয়াককে মিনতি করলাম ওটার একপাশে আরও কাছে যেতে। এমন সময় মোষটা এমন একটা



মহিষটা ঝট ঘুরে হামলা করার চেষ্টা করল

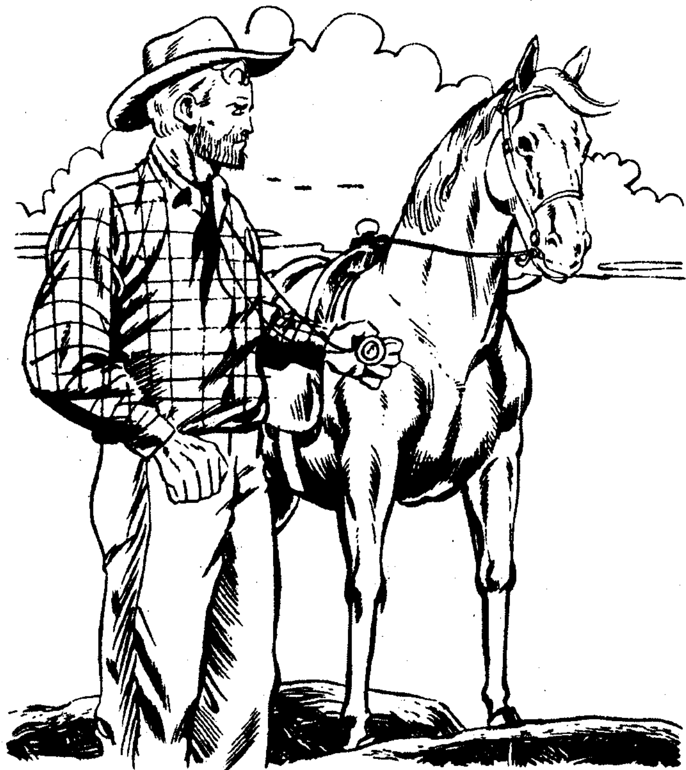
কাণ্ড করল যা দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সব মোষই করে। গতি মন্থর করল সে, ঝট করে ঘুরে গেল, প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া মাথাটা নিচু হলো। হামলা চালাতে যাচ্ছে সে।

ভয়ে চিঁহিহি আর্তনাদ ছাড়ল পন্টিয়াক। এমন লাফ মারল, ঝাঁকুনির চোটে আরেকটু হলে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলাম মাটিতে। ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে ক্রুদ্ধ মহিষ। গুলি ছুঁড়লাম ওটাকে লক্ষ্য করে। লাগল না গুলি।

অনেক হয়েছে, ভাবলাম আমি। এবারে কেটে পড়াই ভাল। ঘনঘন শ্বাস টানছে পন্টিয়াক, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। আমার অবস্থাও কাহিল। যেন গরম পানিতে চোবানো হয়েছে আমাকে। ভাপ বেরুচ্ছে গা

থেকে। আমি পন্টিয়াককে নিয়ে ফিরতি পথে ছুটলাম। তাঁবুতে ফিরব। আশেপাশে কোনো চিহ্ন খুঁজলাম, যা দেখে কোথায় আছি আর ফিরতি পথ কোনদিকে তা চিনতে পারব। মনে হলো সমুদ্রের মাঝখানে দিক খোঁজার মতো অবস্থা হলো। গন্তব্য থেকে কত মাইল দূরে, কোনদিকে চলে এসেছি কোনো ধারণাই নেই আমার।

পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি!



গলায় ঝোলানো কম্পাসে উত্তর দিক দেখে নিয়ে সেদিক পানে চললাম

৫. পথ হারানো...

ভাবলাম উত্তর দিকে গেলে নিশ্চয়ই প্লাট নদী চোখে পড়বে। গলায় ঝোলানো কম্পাসে উত্তর দিক দেখে নিয়ে সেদিক পানে চললাম। কোন বিরতি ছাড়াই দুই ঘণ্টা চললাম... কিন্তু কোন নদীর দেখা মিলল না।

আমি জানতাম না যে ঐখানটাতে প্লাট তার পূর্বমুখী গতিপথ থেকে অনেকখানি বাঁক নিয়েছে, এর ফলে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে আরও গহিন বুনো এলাকার ভেতরে ঢুকে পড়ছি।



অ্যান্টিলোপের স্বভাবজাত প্রবল কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এলো

মোষের পায়ের ছাপ অনুসরণ করা যাক, ভাবলাম। ওদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে কোথাও না কোথাও পৌঁছে যেতে পারব। শীঘ্রই এরকম একটা পথও পেয়ে গেলাম, মোষের পায়ের ছাপে ক্ষত-বিক্ষত। ওরা নদীতে পানি খেতে এই রাস্তা ব্যবহার করে। ওদিকে যেতে আমাকে রাস্তার ডানদিকে ঘুরতে হয়, আর আমি তা করতেই পন্টিয়াক কান খাড়া করে বুঝিয়ে দিল আমি ঠিক রাস্তাতেই চলছি।

ভ্রমণটা নিঃসঙ্গ ছিল না মোটেই। এলাকাটা লাখো লাখো মোষে বোঝাই। অ্যান্টিলোপের সংখ্যাও কম নয়। ওদের স্বভাবজাত প্রবল কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এলো আমাকে দেখতে, ঘাড় ঘুরিয়ে, টলটলে স্বচ্ছ কালো চোখ



মেলে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করেই লাফ মেরে তীরের বেগে ছুটতে শুরু করল।

গিরিখাত এবং গুহায় নেকড়ে চোখে পড়ল। প্রেইরী ডগদের বসতি পার হলাম। ওরা প্রত্যেকে যে যার গর্তের সামনে বসে রয়েছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে, একটু পরপর ছোট লেজ নেড়ে হাঁক ছাড়ছে।

লম্বা, ডোরাকাটা বিষধর সাপেরা প্রেইরী ডগদের বসতির মাঝে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। ছোট ধূসর পেঁচারাও বসে ছিল ডগদের সাথে। ওদের চোখের চারপাশে সাদা, গোল বৃত্ত।

প্রেইরীতে জীবনের অভাব নেই, নেই শুধু মানুষ।

মোষের পায়ে চলা পথ ধরে চলতে চলতে মনে হলো প্রেইরীর চেহারা খানিকটা বদলে গেছে। মাঝে সাঝে দু একটা নেকড়ে চোখে পড়ছে



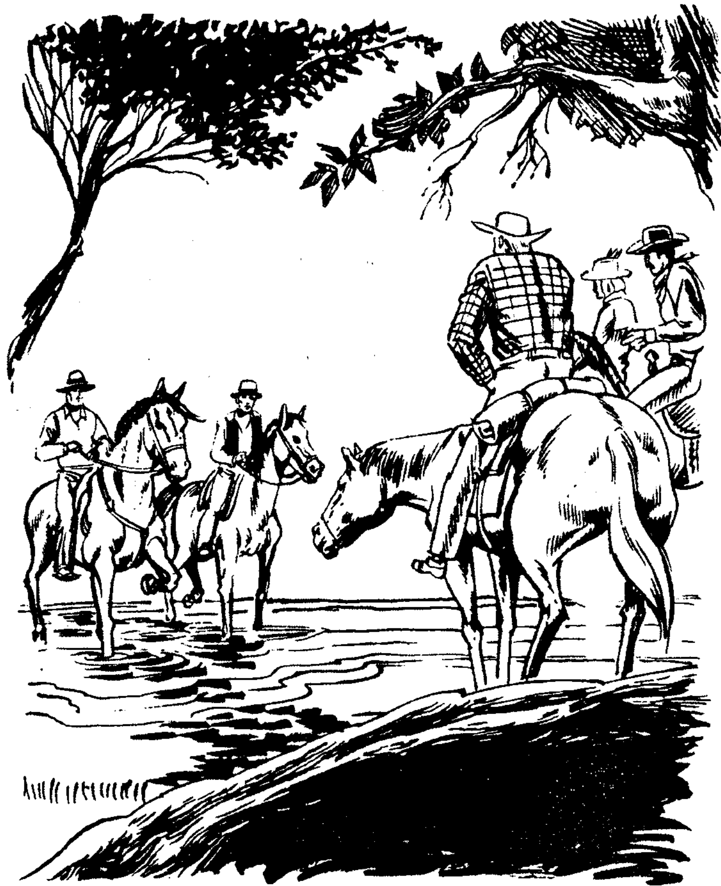
অপেক্ষা করছি আমার দলটা এদিকেই আসবে

কেবল, ডানে-বামে কোথাও-না-কোথায়ও তাকিয়ে ছুটছে। একদম ভিন্ন ধরনের কিছু পোকা-মাকড় চোখে পড়ল। উজ্জ্বল বর্ণালি রঙের এক ধরনের প্রজাপতি পন্টিয়াকের মাথার ওপর উড়ছে। অদ্ভুত গড়নের কিছু গুবরেপোকা দেখতে পেলাম, ধাতব পদার্থের মতো চকচকে গা, গাছে লটকে রয়েছে। বালুর মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গিরগিটি। মনে হলো এটা সে পোকাদের অভয়ারণ্য।

মোষের পদচিহ্ন ধরে আরও অনেকক্ষণ ঘোড়া চালালাম। অবশেষে পৌঁছলাম বালুর একটি পাহাড়ের ধারে। এখান থেকে প্লাট নদী চোখে পড়ল। বিস্তীর্ণ ভূমির বুকে ঝকমক করছে। নদীর ওপাশে পাহাড়ের আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। গাছ কিংবা ঝোপঝাড় কিছুই চোখে পড়ল না। ঝা ঝা রোদ পুড়িয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি।

যে রাস্তাটা খুঁজছিলাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে গেলাম ওটা। রাস্তাটি নদীর দিকে চলে গেছে। আমি পূর্ব দিকে এগোলাম আমার দলের দেখা পাবার আশায়। সকাল থেকেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। আর এখন ছয়-সাত ঘণ্টা একটানা ঘোড়া চালিয়ে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। ঘোড়া থামিয়ে জিন নামালাম মাটিতে। ওটার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। অপেক্ষা করছি আমার দলটা এদিকেই আসবে।

সমভূমির কিনারে সাদা ওয়াগনটিকে দেখতে পেলাম। ঠিক একই সময়, কাকতালীয়ভাবেই হয় তো, পাহাড় থেকে নেমে এল দু জন ঘোড়সওয়ার। ওদেরকে চিনতে পারলাম। কুইন্সি এবং হেনরী। আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল ওরা। যদিও জানত এ দেশে নিরুদ্দেশ মানুষকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ওরা আশা হারিয়ে মূল দলের কাছে ফিরে যাচ্ছিল।



কজন অভিবাসী নদী পার হয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো

৬. ফোর্ট লারামির ট্রেইলে

জুনের ৮ তারিখে আমরা প্লাটের দক্ষিণ শাখাটির মোহনায় এসে হাজির হলাম। নদীর প্রবাহ এখানে খুবই কম, বালুময় নদীবক্ষটি আধা মাইলের মতো চওড়া আর গভীরতা দেড় ফুটের বেশি না মোটেই।

নদীর অপর তীরে অভিবাসীদের ক্যাম্প। কজন ঘোড়সওয়ার নদী পার হয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো। তাদের চেহারায় উদ্বেগ। একজন বলল, 'উপনিবেশ ছেড়ে আসার পর থেকে কপালে ভোগান্তি ছাড়া কিছুই জোটেনি। রাস্তায় কজন সঙ্গীকে হারিয়েছি আমরা। একজনকে পনিরা হত্যা করেছে। সপ্তাহখানেক আগে এক সন্ধ্যায় প্লাট নদীর তীরে তাঁবু গেড়েছি, ছয় শ সিওক্স ইন্ডিয়ান চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে আর হাঁক ছাড়তে ছাড়তে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। কেড়ে নিয়ে গেল আমাদের সেরা ঘোড়াগুলো।

'এরপর এক রাতে পাহারাদার লোকটি ঘুমিয়ে পড়েছিল, নেকড়ের দল হামলে পড়ে একশ তেইশটা জানোয়ার খেদিয়ে নিয়ে যায়। ওগুলোর খোঁজ করেও কোন লাভ হয়নি। জানি ওগুলো উদ্ধার করতে না পারলে কী দশা হবে। সামনে আরও কত দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে কে জানে।'

হয়তো ওরা গাভী আর অল্পবয়সী পশু গাড়িতে জুড়তে বাধ্য হবে। গাড়ির বোঝাও কমিয়ে ফেলতে হবে ওদের, হয়তো মালপত্রের বড় অংশই ফেলে দিতে হবে। আমি প্লাটের তীরে অসংখ্য চমৎকার আসবাবপত্র পড়ে থাকতে দেখেছি। হয়তো ইংল্যান্ড থেকে আসবাবগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল, অরিগনের অন্তহীন যাত্রার জন্য পারিবারিক গাড়িতে তোলা হয়েছিল ওগুলো। কিন্তু এত ভারী আসবাব বহন কষ্টসাধ্য বলে ওগুলো এখন খোলা জায়গায় বিনষ্ট হচ্ছে রোদের খরতাপে।

আমাদের ইংরেজ সঙ্গীদের নিয়ে আমরা মহা বিরক্ত অনেক দিন ধরেই। আমাদের সঙ্গে আলাপ না করেই তারা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। পনের মাইল রাস্তা না যেতেই তাঁবু খাটানোর জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয়। আমরা রাস্তা দ্রুত শেষ করতে চাইলেও, তাদের কারণে ভয়ানক শ্লথ হয়ে উঠল যাত্রা।

বিষয়টি নিয়ে কুইন্সি, হেনরী এবং ডেসলরিয়ার্সের সঙ্গে আলোচনা করলাম। শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে ক্যাপ্টেন সি-কে বললাম, 'ঠিক করেছি নিজেরাই ফোর্ট লারামির উদ্দেশে রওনা হব। আশা করি দ্রুত চললে চার-পাঁচদিনের মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে পারব।'



অভিবাসীদের গাড়ির বোঝা কমানোর জন্য মালপত্রের বড় অংশই ফেলে দিতে হলো।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই রওনা হলাম। ক্যাপ্টেন, তার দল এবং কিয়ার্সলির ওয়াগন পড়ে রইল পেছনে।

চারদিন একটানা পথ চললাম। মাঝে মাঝে বালুর মধ্যে ঘোড়ার পা ডুবে গিয়ে মন্থর করে তুলল যাত্রা। এদিকে সূর্য যেন আগুন ঝরাচ্ছে আকাশ থেকে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বেলে মাছি আর মশা।



ঠিক করেছি নিজেরাই ফোর্ট লারামির উদ্দেশে রওনা হব

পরদিন সকালে একটি সমভূমিতে এসে পৌঁছলাম। নজরে পড়ল কী যেন।

'মোষ?' জিজ্ঞেস করলাম হেনরীকে।

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল হেনরী, চোখ কুঁচকে তাকাল প্রেইরীর দিকে 'ইন্ডিয়ান!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'মনে হয় ওল্ড স্মোকের লোক। চলো দেখা যাক!'

দুই মাইল দূরে দেখা গেল একটি ফুটকি। আকারে ক্রমে বড় হচ্ছে।



এক ইন্ডিয়ান দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে আসছে

অবশেষে মানুষ এবং ঘোড়ার কাঠামোয় রূপান্তর ঘটল। একটু পরে দেখতে পেলাম এক ইন্ডিয়ান দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে আসছে। আমাদের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। বেদম হাঁপাচ্ছে জানোয়ারটা।

আমরা লোকটার সঙ্গে প্রথা অনুযায়ী হ্যাণ্ডশেক করলাম। এ সিওক্স গোত্রের তরুণ এক ইন্ডিয়ান। গোত্রের অন্যদের মতো সেও বেশ লম্বা, প্রায় ছ ফুট। সুগঠিত শরীর, সুদর্শন। তার গায়ে কোন উল্কি নেই। মাথাও টুপিশূন্য। মাথার চুল পিঠ পর্যন্ত লম্বা। চুলের সঙ্গে ঈগলের হাড় দিয়ে তৈরি একটি গহনা এবং পেতলের ঝকঝকে কতগুলো তকমা আঁটা। খুব ভারী গহনা, তবে সিওক্সদের মাঝে খুব জনপ্রিয়।

ইন্ডিয়ানের বুক এবং হাত নগ্ন। কোমরে মহিষের ছাল, বেল্ট দিয়ে বাঁধা।



প্রথা অনুযায়ী হ্যান্ডশেক করল তরুণ ইন্ডিয়ান

পায়ে মোকাসিনের জুতো। পিঠে কুকুরের চামড়ার তূণীর, তাতে অনেকগুলো তীর। কাঁধে শক্তিশালী একটি ধনুক। ঘোড়ার মুখে লাগাম পরানো নেই। শুধু চোয়ালে রশি বাঁধা। খড়ের আস্তর দেয়া কাঠের জিনটার প্রায় আঠারো ইঞ্চি উঁচু।

ইন্ডিয়ানের সঙ্গে হর্স ক্রিকে তাদের ক্যাম্পে গেলাম। সেখানে হেনরী প্রায় নগ্ন, বিশালদেহী এক লোককে দেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। এ হলো সর্দার ওল্ড স্মোক। তার পেছনে একটি খচ্চরের পিঠে বসে আছে তার সবচেয়ে কনিষ্ঠ স্ত্রীটি। পরনে সাদা হরিণের চামড়ার পোশাক। তাতে পুঁতি এবং ধাতব গহনার কাজ করা।



সর্দার ওল্ড স্মোক ও তার কনিষ্ঠ স্ত্রী

সর্দারের স্ত্রীর কপালে এবং দুই গালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা। হাতে সগর্বে খাড়া করে ধরে আছে সর্দারের লম্বা বর্শা। সর্দারের সাদা ঢালখানা খচ্চরের পিঠে ঝুলছে, পাইপ ঝুলছে স্ত্রীর পিঠে।

মৌমাছির মতো ক্যাম্পে ভিড় করে এল যোদ্ধা, নারী এবং শিশুরা। নানান আকার এবং রঙের শত শত কুকুর এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। অগভীর খাঁড়ির পানিতে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি আর হাসাহাসি করছে ছেলেমেয়ে আর সর্দারের বউরা।

এটা ছিল গরমের সময়ে বানানো একেবারেই অস্থায়ী একটা শিবির, কাজেই ঘড়বাড়ি বানানো হয়নি। তবে আলসে সব যোদ্ধাদের স্ত্রীরা খুঁটির ওপর মোষের চামড়া বিছিয়ে ছাউনি করে দিয়েছে নিজ নিজ স্বামীকে, সেখানে তারা বসে আরাম করছে। তার সামনেই যোদ্ধা হিসেবে তার মর্যাদার স্মারকগুলো আছে– তার সাদা মোষের চামড়ার ঢাল, ওষুধের পোঁটলা, ধনুক আর তূণীর, বর্শা ও তামাক খাবার পাইপ– সবকিছুই ত্রিকোণ খুঁটির ওপর টাঙানো।

কুকুরগুলো বাদ দিলে ক্যাম্পে সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ হলো বয়োবৃদ্ধারা। এরা দেখতে ডাইনির মতো, বাতাসে ফরফর করে উড়ছে চুল। মহিষের চামড়ার শতচ্ছিন্ন আলখেল্লা জড়িয়ে রেখেছে চিমসানো শরীরে। এরা আর স্বামীদের কাম্য নয় বলে ক্যাম্পের সবচেয়ে কঠিন এবং ভারী কাজগুলো করে এরা জীবনধারণ করে। ঘোড়া বাঁধা, বাড়ির ছাদের ঢালু ছাউনি বানানো, মোষের চামড়ায় আলখাল্লা তৈরি আর শিকারিদের জন্য মাংস রান্না করে দেয়া– সব তারাই করে।

বুড়িদের কর্কশ কণ্ঠের চিৎকার, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, শিশু এবং মেয়েদের চিৎকার, যোদ্ধাদের আলসে নীরবতা– পুরোটা দৃশ্য মনের ওপর এমন একটা ছাপ ফেলে যা ভোলার নয়।

দুপুরের খাওয়া শেষে বেশ কয়েকজন ইন্ডিয়ান আমাদের যাত্রায় শামিল হলো। ওদের মাঝে একজন ছিল যার ওজন তিন শ পাউন্ডেরও বেশি। বিশাল বপু আর অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সবাই তাকে 'শুয়োর' বলে ডাকে। সে চড়েছে একটি সাদা টাট্টুর ওপর। পিঠে পাহাড় নিয়ে চলতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে বেচারা জানোয়ারদের। 'শুয়োর' সর্দারগোছের কেউ নয়, সর্দার হবার খায়েশও তার নেই। সে যোদ্ধা কিংবা শিকারিও নয়। সৃষ্টিছাড়া মোটা বলে সে বেজায় অলসও। তবে গাঁয়ের সবচেয়ে ধনবান মানুষ সে। ৩০টি ঘোড়ার মালিক। আর সিওক্স গোত্রে যার ঘোড়ার সংখ্যা যত বেশি সে তত বড়লোক বলে পরিগণিত। প্রয়োজনের চেয়ে দশগুণ ঘোড়া আছে তার। তবু আরও ঘোড়ার ক্ষুধা মেটেনি তার।



যোদ্ধাদের স্ত্রীরা খুঁটির ওপর মোষের চামড়া বিছিয়ে ছাউনি করে নিজ নিজ স্বামীকে

আমার দিকে এগিয়ে এল সে। আন্তরিকভাবে করমর্দন করে বোঝাতে চাইল সে আমার প্রকৃত বন্ধু। চর্বির ভাঁজের মধ্যে প্রায় লুকিয়ে থাকা চোখজোড়ায় ঝিলিক খেলে গেল ওর। নানান অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল অদ্ভুত লোকটি। ইন্ডিয়ান ভাষা কিংবা ইশারা কিছুই আমার জানা ছিল না, তাই হেনরীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছে ও?'

হেনরী দেখে হেসে বলল, 'এ লোক দরদাম করতে চাইছে। সে আপনার ঘোড়ার বদলে তার এক মেয়েকে দেবে বলছে।'

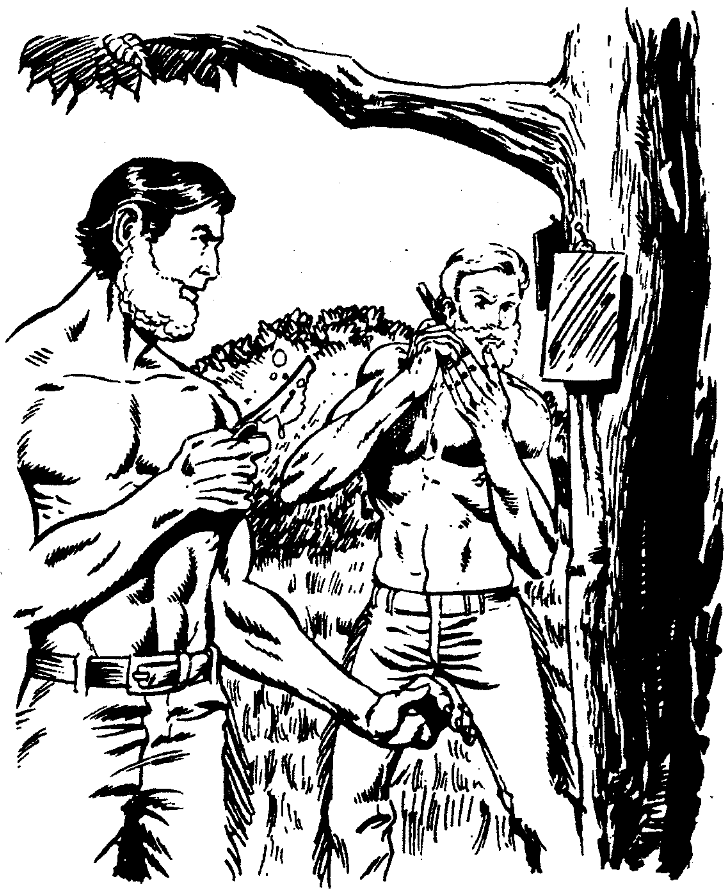
'হেনরী', বললাম আমি, 'ওকে বলো, ওর মেয়ের দরকার নেই আমার।'



আন্তরিকভাবে করমর্দন করে বোঝাতে চাইল সে আমার প্রকৃত বন্ধু

আমার জবাব পেয়েও মুখের হাসি বিন্দুমাত্র ম্লান হলো না শুয়োরের। হাসতে হাসতেই চলে গেল ঘোড়া নিয়ে।

পরদিন, ফোর্টলারামি থেকে মাইল সাতেক দূরে যখন আমরা, ভাবলাম একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। ছয় সপ্তাহ দাড়ি-গোঁফ কামানো হয়নি। গাছের ডালে ছোট আয়না ঝুলিয়ে আমরা ক্ষৌরী করলাম। তারপর প্লাটের কাদা



গাছের ডালে ছোট আয়না ঝুলিয়ে আমরা ক্ষৌরী করলাম

পানিতে যতটা সম্ভব গোসল সেরে নিলাম।

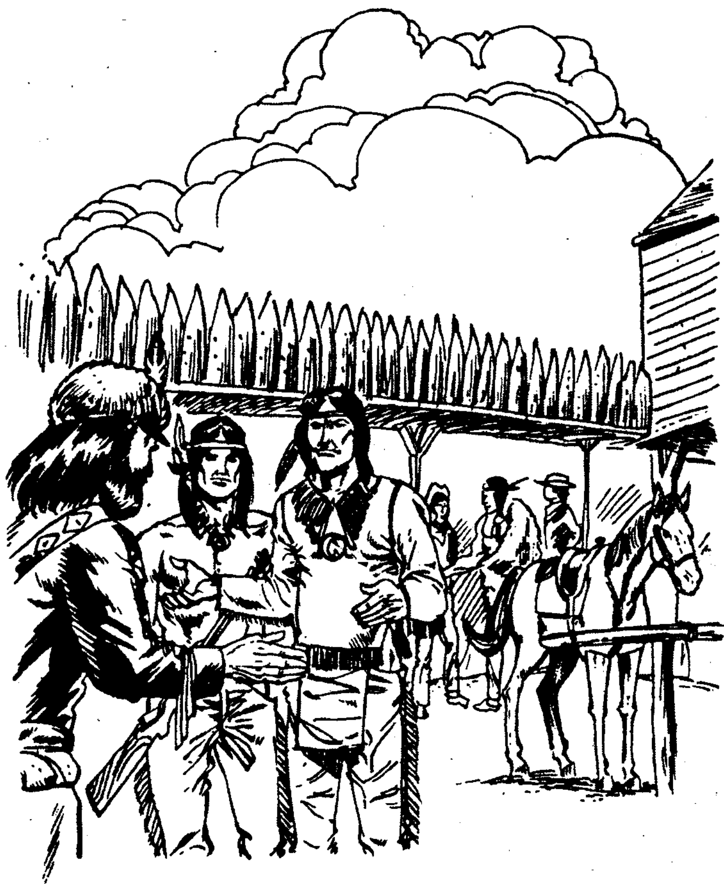
'এবার আমরা ফোর্ট লারামির সমাজে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত!' ফুর্তির চোটে বলে উঠল কুইন্সি।



ফোর্ট লারামি আমেরিকান ফার কোম্পানির স্থাপিত একটি ঘাঁটি

৭. সিওক্স ভোজ

ফোর্ট লারামি আমেরিকান ফার কোম্পানির স্থাপিত একটি ঘাঁটি। এ অঞ্চলের ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। আমেরিকান বাহিনীর মূল ঘাঁটি থেকে দুর্গটি ৭০০ মাইল দূরে।



ফোর্টের ভিতর ইন্ডিয়ানরা এবং ব্যবসায়ীরা

কাদা শুকিয়ে তৈরি ইটের দুর্গটি চারকোনা। দুর্গের দুই কিনারে আর প্রবেশপথের ওপরে রয়েছে পাহারাকক্ষ। মাটির দেয়ালটি পনেরো ফুট উঁচু, তার ওপর আবার সারি সারি সুচাল খুঁটি পোঁতা।

ভেতরের খোলা জায়গায় দেয়ালের গা ঘেঁষে ছোট ছোট কামরা। এর মধ্যে রয়েছে কারখানা, গুদামঘর আর দুর্গের কর্মী ও তাদের রক্ষিতা হিসেবে যে অসংখ্য ইন্ডিয়ান নারীদের রাখার অনুমতি পেয়েছে তাদের

থাকার ঘর। বাড়ির ছাদ ব্যবহার করা হয় বন্দুকবাজদের পাটাতন হিসেবে।

খোলা উঠোনের একটা অংশ খোঁয়াড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওখানে রাতের বেলা ঘোড়া এবং খচ্চর রাখা হয়।

মহিষের সাদা চামড়ার আলখেল্লা পরা লম্বা লম্বা ইন্ডিয়ানরা উঠোনে হেঁটে বেড়াচ্ছে বা ভবনগুলোর নিচু ছাদের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সুন্দর পোশাক পরা ইন্ডিয়ান রক্ষিতারা তাদের ঘরের সামনে বসে আছে, তাদের দোআঁশলা বাচ্চারা খেলায় ব্যস্ত। শিকারি, ব্যবসায়ী এবং দুর্গের কর্মচারীরা যে যার কাজ কিংবা ফুর্তিতে মশগুল।

আমরা এখানে পৌঁছবার পরদিন সকালে দেখলাম ওল্ড স্মোকের লোকজন লারামি ক্রিক পার হয়ে দুর্গের দিকে আসছে। ঘোড়া, কুকুর এবং ইন্ডিয়ানদের কোলাহলে খাড়ির পানি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। কয়েকটি ঘোড়া ছাউনি বানানোর লম্বা লম্বা কাঠের খুঁটি টেনে নিয়ে আসছে। প্রতিটি খুঁটির একপ্রান্ত ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা, অন্য প্রান্তটি মাটিতে ছেঁচড়ে আসছে। দুটি খুঁটির মাঝখানে বাধা একটা ঝুড়ি। যেসব মাল ঘোড়ার পিঠে নেয়া যায়নি, সেগুলো এই ঝুড়িতে নেয়া হয়েছে। কয়েকটি ঝুড়িতে রয়েছে কুকুরছানা, শিশু কিংবা অশীতিপর বৃদ্ধ। কানাডীয়রা এই অদ্ভুত বাহনটিকে বলে ট্রাভোইস। দু পাশে জল ছিটিয়ে তারা খাড়ি পার হলো।

এই ভিড়ের মাঝ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে এল ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা। মহিলারাও মালটানা ঘোড়ায় চড়ে ইতিমধ্যেই ভারাক্রান্ত ঘোড়াগুলোর দুর্দশা বাড়িয়ে তুলছে। হট্টগোলের কোন শেষ নেই। ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরগুলো, একযোগে ডাক ছাড়ছে। ঝুড়িতে বসা কুকুরছানারা বিলাপ তুলেছে করুণ স্বরে। কালোচোখা শিশুরা পানির ঝলক সামলাতে ঝুড়ির কিনারা শক্ত করে ধরে দুর্বোধ্য শব্দ করছে মুখে।

শিগগিরই তারা পৌঁছে গেল তীরে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল সবাই। প্রতিটি পরিবার, তাদের ঘোড়া এবং জিনিসপত্র নিয়ে দুর্গের পেছনের সমভূমি



ওল্ড স্মোকের লোকজন ছারানি ক্রিক পার হয়ে দুর্গের দিকে আসছে

লক্ষ্য করে ছুটল। আধঘণ্টার মধ্যে ষাট-সত্তরটা মোচা আকারের ছাউনি দাঁড়িয়ে গেল। ওদের ঘোড়াগুলো প্রেইরীর মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে। কুকুরগুলো ইচ্ছেমতো ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। দুর্গ ভরে গেল যোদ্ধাদের ভিড়ে, ইন্ডিয়ান শিশুরা দেয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে শোরগোল তুলল।

নবাগতদের আগমনের কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম পাহাড় থেকে অভিবাসীদের ওয়াগনের বিশাল এক কাফেলা নেমে আসছে। নদীতীরে পৌঁছুল ওরা, পার হলো নদী। দুর্গ থেকে সিকি মাইল দূরে গিয়ে যাত্রা



দুর্গ থেকে সিকি মাইল দূরে তারা যাত্রা বিরতি দিল

বিরতি দিল। বৃত্তাকারে রাখল তাদের ওয়াগনগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোর্ট লারামি কর্মচঞ্চল হয়ে পড়ল, অভিবাসীরা তাদের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ কিনল ফোর্ট লারামি থেকে।

ফোর্ট লারামিতে বেশিরভাগ সন্ধ্যা কাটল ইন্ডিয়ান গ্রামে। ইন্ডিয়ানদের কেন যেন ধারণা হয়েছে কুইন্সি ডাক্তার, আর আমাদের তারা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। তাদের প্রায় সবার অভিযোগ– চোখ জ্বালা করে।



কুইন্সি সর্দারের সুন্দরী মেয়ে থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধা নারী পর্যন্ত সবারই চিকিৎসা করল

সূর্যের নিচে খোলা চোখে থাকার কারণে এমনটি হচ্ছে। কুইন্সি আমাদের ওষুধের ভাণ্ডার থেকে চোখে লাগাবার মলম ব্যবহার করে সহজেই এ রোগের চিকিৎসা করল।

একবার আমরা ওল্ড স্মোকের কুটিরে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, ওল্ড স্মোক সর্দার হলেও সিওক্স সমাজ খুবই গণতান্ত্রিক। সর্দার বলে আলাদা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না সে, তাকে বাড়তি কোন মর্যাদাও



ওল্ড স্মোকের অভ্যর্থনামূলক ভোজে অংশ নিয়ে হৃদ্যতার সাথে খেলাম।

দেয়া হয় না। কাজেই কুইন্সি সর্দারের সুন্দরী মেয়ে থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধা নারী পর্যন্ত সবারই চিকিৎসা করল।

আমরা যখন বসে বসে কুইন্সির কাজ দেখছিলাম, তখন ওল্ড স্মোকের সবচেয়ে বয়স্কা বউ ছাউনিতে ঢুকে আমাদের পাশে বসল, তার হাতে বড় একটা কাঠের বাটিতে সিদ্ধ করা কুকুরের মাংস! সিওক্সদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার।

আমি আর কুইন্সি পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললাম। আমরা জানতাম যে সিওক্সরা যাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে, শুধু তাদেরকেই কুকুরের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করে। আর এ মাংস না-খাওয়া মানে ওদেরকে অপমান করা। কাজেই আমরাও অভ্যর্থনামূলক ভোজে অংশ নিয়ে হৃদ্যতার সাথে খেলাম।

খাওয়া শেষ হলে তার বিশাল পাইপ ধরাল ওল্ড স্মোক। সে আগুন ধরাল, আমরা পালা করে টানতে লাগলাম পাইপ। একজন কয়েকটা দম ধূমপান করে তারপর আরেকজনের হাতে ওটা ধরিয়ে দিচ্ছি। এভাবে চলতে লাগল ধূমপানপর্ব।

ভোজ ও ধূমপান শেষে ইন্ডিয়ান বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললাম দুর্গে।



ঘূর্ণিঝড় এখন প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

৮. যুদ্ধ! যুদ্ধ!

যুদ্ধ!

বিগত বছরগুলোতে পশ্চিম সিওক্স জাতির ওগালা গোত্রের দশজন যোদ্ধা, এদের মধ্যে হুইর্লউইন্ড বা ঘূর্ণিঝড় নামের এক সর্দারের ছেলেও আছে, খুন হয়েছে স্নেক বা সর্প নামের আরেক ইন্ডিয়ান গোত্রের হাতে।

ঘূর্ণিঝড় এখন প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সে তিন শ মাইল এলাকার মধ্যে যত সিওক্স ইন্ডিয়ান আছে তাদের সবাইকে আহ্বান জানাল সর্পদের শায়েস্তা করার জন্য। কমপক্ষে ছয় হাজার ইন্ডিয়ান এল ঘূর্ণিঝড়ের ডাকে সাড়া দিতে। যুদ্ধের বৈঠক হবে প্লাটের তীরে 'লা বোন্তে ক্যাম্প'-এ। এখানে যুদ্ধ শুরুর আগে কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তারা শত্রু এলাকায় হানা দেয়।

'এটাই সুযোগ, কুইন্সি!' বললাম আমি, 'আমি এসেছি ইন্ডিয়ানদের জীবনযাপন পর্যবেক্ষণ করতে'। তুমি যদি আমার সাথী হও, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি আমরা... ওদের গাঁয়ে যাব... ঘুমাব ওদের কুঁড়েতে... দেখব ওরা কীভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে! চলো লা বোন্তে ক্যাম্পে যাই!'

তবে যেমনটি ভাবলাম সেভাবে ঘটল না ঘটনা।

একদিন সকালে এক তরুণ ইন্ডিয়ান দুর্গে এল দুঃসংবাদ নিয়ে। নিজের পরিচয় দিল সে অশ্ব বলে। জানাল হেনরীর স্ত্রী ঘূর্ণিঝড়ের গাঁয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জায়গাটা কয়েক দিনের পথ।

মেয়েটির অসুস্থতার খবর শুনে মরার আগে তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল হেনরী, তা ছাড়া মেয়েটার সন্তানদের একটা ব্যবস্থা করাটাও তার দায়িত্ব।

'আমরা সেক্ষেত্রে স্মোকের গাঁয়ে যাবার ধান্ধা ভুলে যাচ্ছি,' বললাম আমি হেনরীকে, 'বদলে আমরা তোমার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের গ্রামে যাচ্ছি।'

'কিন্তু মশাই,' আপত্তি জানাল হেনরী, 'আপনিও তো কয়েক সপ্তাহ ধরেই অসুস্থ। মনে হয় না যাত্রার ধকল আপনি সামলাতে পারবেন। আপনার যাওয়া একদম ঠিক হবে না'।

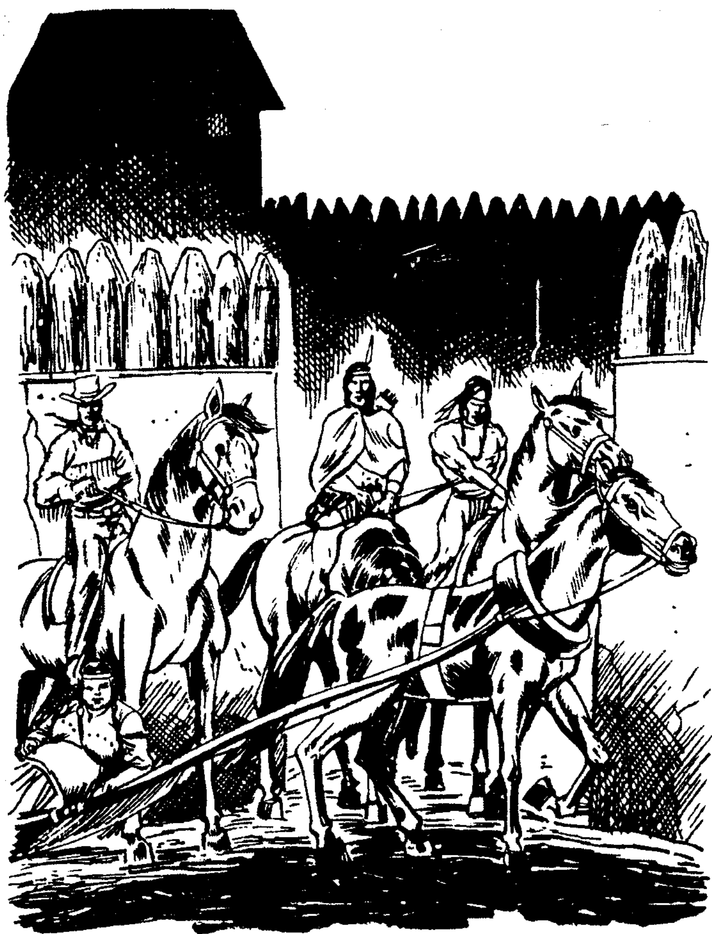
কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছি আমি। দলের অন্যান্য সদস্যরাও তাই। জুনের বিশ তারিখ আমরা লারামি খাড়িটা ধরে এগোলাম ঘূর্ণিঝড়ের গাঁয়ের উদ্দেশে। দলে ডেসলরিয়ার্স, হেনরী, কুইন্সি এবং আমি ছাড়াও আছে লম্বা চুলের এক কানাডিয়ান রেমণ্ড। একে আমাদের দলে



এক তরুণ ইন্ডিয়ান দুর্গে এল দুঃসংবাদ নিয়ে

শক্তিবৃদ্ধির জন্য ভাড়া করেছি, আছে রেনাল নামে এক ব্যবসায়ী। রেনালের সঙ্গে আছে তার বউ মারগট। মারগটের ওজন দু শ পাউন্ড। তার সঙ্গে তার দুই ভাতিজাও, একজন হলো অশ্ব, যে হেনরীর বউয়ের খবর নিয়ে এসেছে, অপরজন তার ছোট ভাই শিলাঝড়।

দ্বিতীয় দিন আমরা লারামি ক্রিকের তীরে বিরাটাকার এক প্রাচীন তুলাগাছের নিচে তাঁবু গাড়লাম। এখানেই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অপেক্ষা



করব। ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান অবস্থান ও গতিবিধি নিয়ে কেউ কোন নিশ্চিত তথ্য দিতে না পারলেও লা বোন্তে ক্যাম্পে যাওয়ার পথে নিশ্চিতভাবেই এ গাছের নিচ দিয়েই যাবে। তা ছাড়া শক্ত মাটিতে চলতে চলতে আমাদের ঘোড়াগুলোও অবসন্ন হয়ে পড়েছে, আমার অবস্থাও খারাপ। হেনরী অশ্ব-কে পাঠাল ঘূর্ণিঝড়ের লোকজনের খোঁজে, তার ইন্ডিয়ান



ভাল খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম শরীরে বল ফেরত নিয়ে এলো

প্রেয়সীর জন্য একটা বার্তাও পাঠাল। তাতে বলা ছিল সে আর তার আত্মীয়রা যেন বাকিদের ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের ক্যাম্পে চলে আসে।

বেশ কিছুদিন বিশ্রাম আর ভাল খাওয়া-দাওয়া শরীরে বল ফেরত নিয়ে এলো। তবে ইন্ডিয়ানরা তখনও ফিরছে না দেখে বিরক্ত বোধ করছিলাম, ওদের অবিশ্বস্ত আচরণের কারণে গালিগালাজও কম করলাম না। শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলাম, 'কাল সকালে দুর্গে গিয়ে দেখব অন্য কোন যুদ্ধ-



ভোরবেলায় তিন জনে ক্যাম্প ত্যাগ করল

দলের খোঁজখবর পাই কিনা।'

সে রাতেই অশ্ব ফিরে এল ঘূর্ণিঝড়ের গাঁ থেকে। সর্দার পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে, আস্তে-ধীরে এগোচ্ছে সে, এক সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয়। হেনরীর বউ তার ভাইদের সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব চলে আসার চেষ্টা করছে। তবে তার অবস্থা খুবই সঙ্গিন, যেকোন সময় মারা যেতে পারে। সর্বক্ষণ শুধু হেনরীর নাম জপছে বেচারা।

হেনরীর চেহারায় অন্ধকার ঘনাল, 'পার্কম্যান, আপনার অনুমতি পেলে আমি সকালে ওকে খুঁজতে যাব।'

কুইন্সি তার সঙ্গে যেতে চাইল। আমি যাব দুর্গে, খবর সংগ্রহ করতে। ভোরবেলায় তিন জনে ক্যাম্প ত্যাগ করলাম।

দুর্গে পৌঁছে শুনি মিনিকনজু সিওক্সদের দুটি বড় গ্রাম থেকে ইন্ডিয়ানরা তিন শ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে আসছে। তারা রিচার্ড ফোর্টে জমায়েত হয়েছে। ফোর্ট লারামি থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা। আমি ওখানে চলে গেলাম। যা দেখলাম তাতে রীতিমতো বিস্মিত হলাম। বোঝা গেল সিওক্সরা পথে ক্যালিফোর্নিয়াগামী একদল অভিবাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে তাদের সাথেই এসেছে। অভিবাসীরা যাত্রার মাঝখানে আবিষ্কার করে যে, তাদের মালপত্রের বোঝাটা বড্ড বেশি, বিশেষ করে মিসৌরী হুইস্কির অভাব নেই। তারা কিছু মদ দুর্গের লোকদের কাছে বিক্রি করে বাকিটা নিজেরা গলাধঃকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে যে দৃশ্যটা আমাকে দুর্গে স্বাগত জানাল, সেটি হলো মোষের চামড়ার স্তূপের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা সব ইন্ডিয়ান রক্ষিতা... তীরধনুক হাতে জীর্ণ পোশাক পড়া মেক্সিকান.... লম্বা চুলের কানাডীয় শিকারি.... অরণ্যবাসী মার্কিনিদের নিত্যসঙ্গী পিস্তল আর বাউই ছুরির নৈপুণ্য প্রদর্শনী– আর এরা সক্কলেই ছিল মাতাল!

পরদিন সকালে ফোর্ট লারামিতে বসে ম্যাকক্লাস্কি নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক ইন্ডিয়ানকে চোখে পড়ল গেটের ধারে। লম্বা-চওড়া বিশাল দেহ। গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলাম ম্যাকক্লাস্কিকে।

'ও ব্যাটাই তো ইন্ডিয়ান সর্দার ঘূর্ণিঝড়, যুদ্ধের প্রধান হোতা,' জবাব দিল ম্যাকক্লাস্কি, 'সিওক্সদের স্বভাব এরকমই। সারাক্ষণ সুযোগ খোঁজে কে কার গলা কাটবে। শীতকালে ঘরে বসে মোষের চামড়ার আলখাল্লা বানিয়ে আমাদের সাথে ব্যবসা করলে পারে, কিন্তু তা না করে যুদ্ধের ধান্ধা খোঁজে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সামনের মৌসুমে আমাদের ব্যবসা মন্দা যাবে।'

অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও একমত হলো ম্যাকক্লাস্কির সঙ্গে। তারা সবাই মিলে ঘূর্ণিঝড়কে বোঝানোর চেষ্টা করল যুদ্ধ না হলেই তার অনেক বেশি



এরা সকলেই ছিল মাতাল।

লাভ হবে। যুদ্ধে সিওক্সরা প্রচুর ঘোড়া হারাবে, ফলে সাদা মানুষদের সঙ্গে বাণিজ্য করার মতো পর্যাপ্ত মোষ শিকার করার সময় তারা আর পাবে না।

ঘূর্ণিঝড়ও অবশ্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বাচ্চারা যেমন প্রিয় খেলনা নিয়েও একসময় বিরক্ত হয়ে ওঠে। সেও যুদ্ধ না করতে রাজি হলো।



ম্যাকক্লাস্কি ঘূর্ণিঝড়কে বোঝানোর চেষ্টা করল না হলেই লাভ হবে

আমি কিন্তু ইন্ডিয়ান যুদ্ধপ্রস্তুতির আচার-অনুষ্ঠানগুলো দেখার কৌতূহল মেটানোর আশা ছাড়লাম না। ঘূর্ণিঝড় যেহেতু সিওক্স জাতির কাছে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে অনেক আগেই, তারা তখনও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে চলছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ইতিমধ্যেই লা বোন্ডের পথে রওনা হয়ে গিয়েছিল ছটি গাঁয়ের যুদ্ধবাজ সিওক্সরা ।

আমি যেদিন আমাদের লারামি ক্রিকের ক্যাম্পে ফিরে এলাম, তার



বেচারা তার সাথে শেষ কথাটা বলার জন্যই শুধু বেঁচে ছিল

পরদিন এল কুইন্সি এবং হেনরী। হেনরী তার বউয়ের সঙ্গে দেখা করেছে, বেচারা তার সাথে শেষ কথাটা বলার জন্যই শুধু বেঁচে ছিল। আমাদের ক্যাম্পে ফেরার পথে মারা গেছে মেয়েটা। ওর ভাইরা বোনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করল, হেনরী আর কুইন্সি রওয়ানা হয়ে গেল ক্যাম্পে। শোকাতুর হেনরী অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, বেশ খানিকটা সময় পর স্বাভাবিক হয়ে এল সে।



অবশেষে আগমন ঘটল ঘূর্ণিঝড়ের।

কয়েকদিন পরে চার তরুণ ইন্ডিয়ান এল আমাদের ক্যাম্পে। এরা হেনরীর মৃত বউয়ের ভাই। আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খেল। ধূমপান করার সময় জানতে চাইলাম ঘূর্ণিঝড়ের গ্রামবাসীরা কোথায়।

'ওদিকে,' দক্ষিণ দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল সবচেয়ে ছোট ভাই মাহতো-টাটোনকা, 'দুই দিনের মধ্যে ওরা এখানে চলে আসবে।'

ঘূর্ণিঝড়ের গ্রামবাসীরা যে যুদ্ধ করবে তা হেনরীর শ্যালকদের কাছ থেকে জানলাম।

ব্যবসায়ীরা তা হলে ঘূর্ণিঝড়কে রাজি করাতে পারেনি! আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে ভেবে ভাল লাগল। এবার কোনোকিছুই আমাকে লা বোন্তে ক্যাম্পে গিয়ে যুদ্ধকৃত্য দেখতে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারবে না।

তৃতীয় দিনেও যখন ঘূর্ণিঝড়ের গ্রামবাসীরা এলো না, আমরাই তাদের সন্ধানে বের হলাম। ৮০০ ইন্ডিয়ানের বদলে আমরা কেবল একজনমাত্র বুনোকে আসতে দেখলাম। সে জানাল ইন্ডিয়ানরা তাদের পরিকল্পনা পাল্টেছে, তারা আরও তিন দিনের আগে আসছে না।

চার দিন পরে বিশাল একটা শোভাযাত্রা যেন হুড়মুড় করে পাহাড় বেয়ে নেমে এলো– ঘোড়া, খচ্চর, কুকুর, যোদ্ধা, তাদের বউ, বাচ্চাকাচ্চা। তারপর যেন ভোজবাজির মতো দেড়শ লম্বা লম্বা ছাউনি তৈরি হয়ে গেল নদীর ধারে। নির্জন সমভূমি যেন চোখের পলকে পরিণত হলো হট্টগোলে ভরা বিরাট ক্যাম্পে। অবশেষে আগমন ঘটল ঘূর্ণিঝড়ের!

কিন্তু সে কি যুদ্ধে যাবে সন্দেহ হলো আমাদের?

অবশেষে মিলল জবাব 'ঘূর্ণিঝড় এবং তার যোদ্ধারা লা বোন্তে ক্যাম্পে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদলে তারা ব্লাক হিল পার হয়ে ওপারে কটা সপ্তাহ কাটাবে মোষ শিকার করে, যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় রসদপাতি যোগাড় হয়। জীবনধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় এগুলো: খাবার, জ্বালানি, পোষাক, ছাউনি বানানোর জন্য চামড়া, ধনুকের ছিলা, জিনের আবরণ, আঠা, সুতা, দড়ি আর পানি রাখার মশক। মোষ তাদের এইসব চাহিদাই মেটায়, আরও যা কিছু দরকার সেটাও বণিকদের কাছে মাংস আর চামড়া বিক্রি করে তারা পায়। কাজেই বেঁচে থাকার জন্য মোষ শিকার তাদের জন্য অপরিহার্য। শিকার শেষে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে ছোট একটা বাহিনী পাঠাবে।

আমি এখন কী করি? ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে থাকব নাকি লা বোন্তে ক্যাম্পে যাব? গেলেই বা কি লাভ হবে, অন্য গ্রামগুলোও হয়তো দেখা যাবে



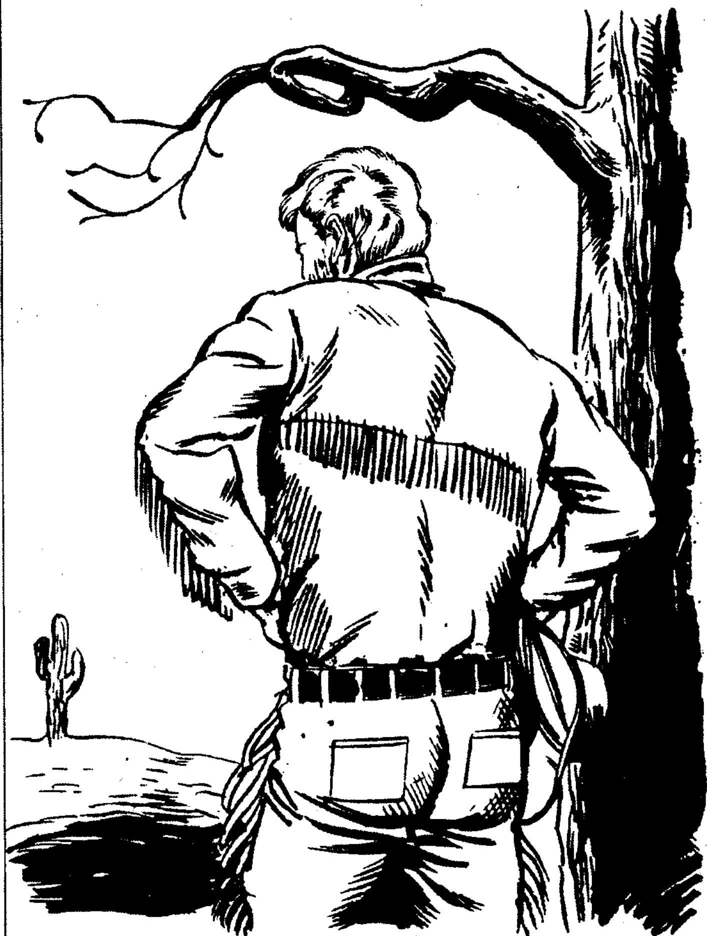
ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল

ঘূর্ণিঝড়ের মতোই সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছে। হতেই পারে সেখানে কোন ইন্ডিয়ানই নেই। ব্যবসায়ী রেনাল বলেই দিল লা বোন্তে ক্যাম্পে কারও থাকার সম্ভাবনা নেই, কাজেই সে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ব্ল্যাক হিলেই যাবে। অনিশ্চয়তার দোলাচলে খানিক ভুগে আমরাও ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। হাজার হলেও প্রবাদে বলে হাতের একটা পাখি ঝোপের দুটো পাখির চেয়ে ভাল।



ওরা লা বোন্তে ক্যাম্পে যাচ্ছে

জুলাইয়ের ১ তারিখ সকালে ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে ফোর্ট লারামি থেকে খুব বেশি দূরে যাই নি, এমন সময় ফাঁদপেতে শিকার করা এক লোকের সাথে দেখা হয়ে গেল। হেনরীর কিছু ব্যবসায়ী বন্ধু তাকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে, ওরা লা বোন্তে ক্যাম্পে যাচ্ছে, ওদের আশা ওখানে আমাদের সাথে দেখা করবে। ওরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলল ওখানে দশ-বারোটি



কিচ্ছু নেই, শুধু ধু-ধু মরু।

গাঁয়ের মানুষ জমায়েত হবে। কুইন্সি এবং আমি শলাপরামর্শ শেষে ওখানেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর একটা ভ্রমণ শেষে আমরা সমভূমিতে এসে পৌঁছলাম। লম্বা, ঘন গাছের সারির সমভূমির ওপারটা আড়াল করে রাখে দৃষ্টি থেকে, যদিও ওখানে কী আছে তা আমার জানা।

'কুইন্সি, ওই গাছের পেছনে ইন্ডিয়ানদের মিলনস্থল,' বললাম আমি। কিন্তু ওই বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্থানটিতে আমার গলার স্বর ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা গেল না, সব খা খা করছে! গাছপালার ভেতর দিয়ে আমরা আরেকটু সামনে এগিয়ে ওপারে আবার বিস্তীর্ণ প্রেইরী দেখতে পেলাম, সেটা ছাউনি আর ইন্ডিয়ানে ভরা নয় মোটেই, 'কিচ্ছু নেই কুইন্সি, কিচ্ছু না... শুধু ধু-ধু মরু!'

ক্রুদ্ধ কুইন্সি তার ঘোড়াকে চাবুক হাঁকিয়ে তীব্র বেগে ঘোড়াকে ছুটিয়ে তার রাগ ঝাড়ল। আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্রুদ্ধ ও হতাশ হলেও অসুস্থতার কারণে এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছি যে ওর মতো করে রাগ ঝাড়ার উপায় আমার নেই। আমি তাই ধীরে ঘোড়া ছুটিয়ে ওকে অনুসরণ করলাম। ইন্ডিয়ানরাই যে শুধু সেখানে ছিল না, তাই নয়, যে ব্যবসায়ীদের আমাদের সাথে দেখা করার কথা ছিল তারাও আসেনি!



মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের মতো ওই ব্যবসায়ীরাও আর আসবে না

৯. ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে

এখানে ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম ব্যবসায়ীদের খবরের জন্য। ইন্ডিয়ানরা কীভাবে জীবনযাপন করে দেখার জন্য এতদূর এসেছি, ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগটা হারাতে চাইলাম না। তবে কুইন্সির ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল।

'দেখো, ফ্রান্সিস, ওই ব্যবসায়ীদের জন্য অপেক্ষা করতে দুটো দিন এখানে ক্যাম্প করেছি' বলল সে, 'হেনরী এবং আমি প্রতিটি দিকের অনন্ত দশ মাইল রাস্তা চষে বেরিয়েছি। একজন ইন্ডিয়ানও চোখে পড়েনি, একটা মোষও না। মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের মতো ওই ব্যবসায়ীরাও আর আসবে না।'

'ঠিক আছে, কুইন্সি,' বললাম আমি, 'আরেকটা দিন অন্তত অপেক্ষা করি। এর মধ্যে যদি ওরা না আসে তো ডেসলরিয়ার্স গাড়ি আর মালপত্র নিয়ে ফোর্ট লারামিতে ফিরে যাবে, আমরাই ঘূর্ণিঝড়ের গাঁয়ে যাব।'

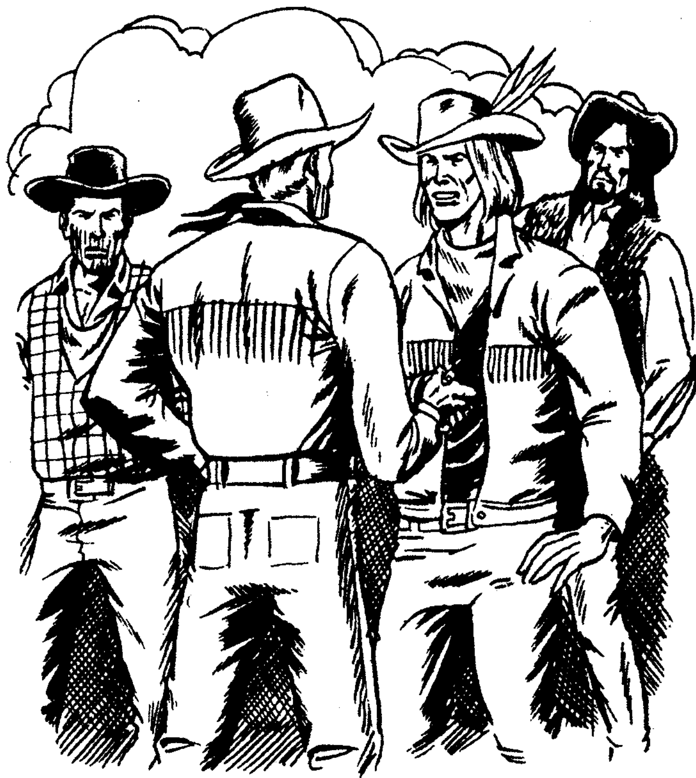
'ফ্রান্সিস, ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করার অত খায়েশ আমার নেই। আমি বিপর্যস্ত। ওইসব পাহাড় আর বিস্তীর্ণ বাইতে বাইতে আমার ঘোড়াটাই খোঁড়া হয়ে গেছে।'

'সেক্ষেত্রে রেমন্ডকে নিয়ে আমি একাই ঘূর্ণিঝড়কে খোঁজার চেষ্টা করব।'

এভাবেই কয়েক দিনের জন্য আমাদের শেষ সভ্য আহার শেষে আমি আর রেমন্ড বাকিদের সাথে করমর্দন করে বিদায় নিলাম। ঠিক হলো আমরা দুজন আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ফোর্ট লারামিতে ফিরব, তারপর আমরা পাহাড়ের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

বিষণ্ন ব্লাক হিলস পাড়ি দেয়ার সময় ইন্ডিয়ানদের নিশানা খুঁজলাম তন্ন তন্ন করে। তাদেরকে দেখতে না পেয়ে আশঙ্কা হলো আমরা হয়তো ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ মাটিতে মোকাসিন জুতোর ছাপ চোখে পড়ল, গর্তও দেখলাম বেশ কয়েকটা, খুঁটি গাড়ার চিহ্ন। মানুষজনের পায়ের ছাপ এবং ঘোড়ার খুরের ছাপও দেখা গেল। আর কমপক্ষে দেড় শ জায়গায় আগুন জ্বালানোর চিহ্ন। উত্তেজিত হয়ে চিহ্ন লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম আমরা, শক্ত মাটিতে ট্রেইল হারিয়ে ফেলছিলাম, অনেক খুঁজে খুঁজে এগোতে হলো তাই।

সরু গিরিখাত, গভীর খাদ এবং দিনের বেলাও অন্ধকার জমাট বাঁধা গিরিখাতের মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে ঘোড়াগুলোকে চালিয়ে নিয়ে চলেছি আমরা। শত ফুট উঁচু পাহাড়ি টিলা পার হলাম, চূড়াগুলো সুইয়ের মতো খাড়া এবং ধারাল।



বাকিদের সাথে করমর্দন করে বিদায় নিল

ঘোড়ার জিনে প্রায় ঝুলে পড়েছিলাম আমি, খাড়া হয়ে থাকার শক্তিই পাচ্ছিলাম না। খাড়া জায়গাগুলো হামাগুড়ি দিয়ে পাড় হতে হলো, জানোয়ারটা ওসব জায়গায় আমার ভার আর বইতে পারছিল না।

আমরা বিপজ্জনক শোশোন এবং আরাফো ইন্ডিয়ানদের এলাকায় প্রবেশ করলাম। যেকোন মুহূর্তে ওদের চোখে পড়ার ঝুঁকি নিয়েই চলতে হলো। ওরা একবার আমাদের দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই, স্রেফ শেষ করে দেবে। আমাদের কাছে সামান্য কিছু ময়দা ছাড়া কোন খাবারও নেই।



হঠাৎ মাটিতে মোকাসিন জুতোর ছাপ চোখে পড়ল

আমার এবং আমার ঘোড়ার শক্তি এবং উদ্যম প্রায় নিঃশেষ হওয়ার পথে।

মাইল খানেক বা তারও বেশি এগোবার পরে ওগলালা ইন্ডিয়ানদের লম্বা কুটির চোখে পড়ল, একটা নদীর ধারে—ওরা পশ্চিমা সিওক্সদের একটা গোত্র। ঘোড়া আর ইন্ডিয়ানরা গিজগিজ করছে ওখানে। ক্যাম্পটা দেখতে পেয়ে যে কী খুশি হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না!



আমাদেরকে সোৎসাহে স্বাগত জানাল

রেনাল ওদের সঙ্গে ছিল বলে ওরা জানত আমরা কারা। ওরা আমাদেরকে সোৎসাহে স্বাগত জানাল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ওগলালা গাঁ হয়ে উঠল আমার বাড়ি; সর্দার, তার বউ, বাচ্চাকাচ্চা হলো আমার পরিবার।

রেমন্ড এবং আমি যার আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম, তার নাম বড় কাক। সাদা অতিথি পেয়ে সে রীতিমতো সম্মানিত বোধ করল। তার বাড়ির সামনে অতিথিদের জন্য বরাদ্দ করা জায়গায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা

হলো। আমরা রাতে তার মোষের আলখাল্লার ওপর ঘুমালাম, তার পাইপে ধূমপান করলাম, একই পাত থেকে খেলাম সিদ্ধ করা মোষের মাংস।

মাঝে মাঝে তামাটে রঙের ন্যাংটো বাচ্চারা আর তরুণী বউয়েরা তাঁবুর ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে গাঁয়ের নানান জায়গায় ভোজের আমন্ত্রণ জানাত। আশ্রয়দাতাদের মনে দুঃখ দিতে চাইনি বলে আমাদের কুটিরে ঘুরে বেড়াতে হতো, প্রতিটি কুটিরেই আমাদেরকে বাটিভর্তি মহিষের মাংস পরিবেশন করা হলো। সেই সঙ্গে গৃহকর্তার সাথে ধূমপানেরও সুযোগ মিলল। তবে শারীরিক দুর্বলতা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে একদিনে কুড়িটি বাড়ির দাওয়াত রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না।

তবে এটা আমি বুঝলাম যে, এদের মধ্যে অর্ধেকই যদি প্রেইরীতে আমাদের একাকী আর অরক্ষিত অবস্থায় পেত তখন একটামাত্র তীর খরচ করে ঘোড়াটা লুট করতে দ্বিধা করত না।

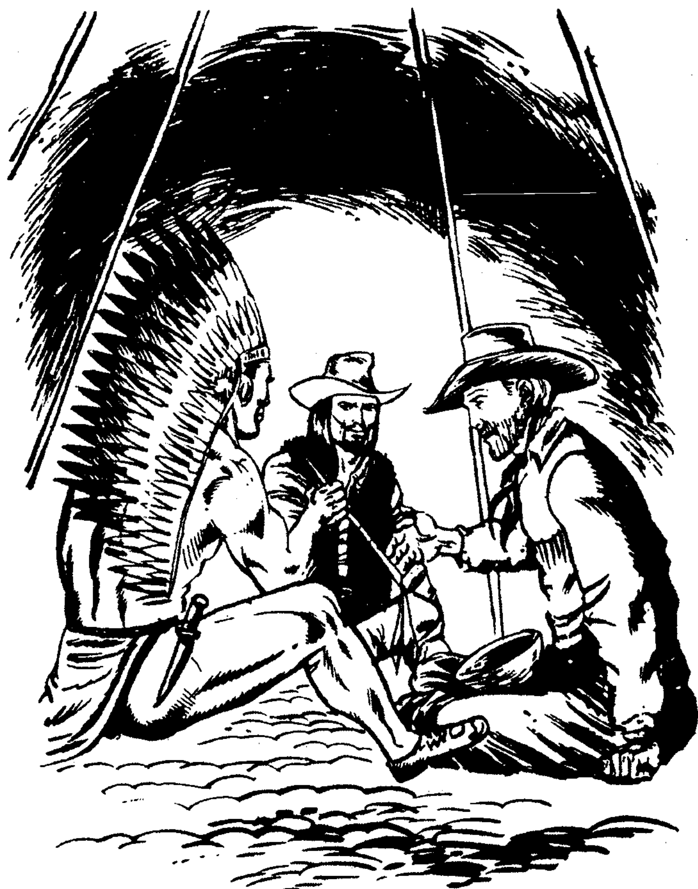
একদিন ইন্ডিয়ানদেরকেও দাওয়াত করে খাওয়ালাম। কিছু সিঁদুর, পুঁতি আর রঙিন গহনার বদলে একটা সাদা কুকুর কিনে নিলাম। আরও কিছু গহনা দিয়ে ভাড়া করলাম দুটি ইন্ডিয়ান তরুণী কুকুরের মাংস রান্না করার জন্য। রেমন্ড মহিষের চর্বি দিয়ে পরোটা বানাল। তীব্র-মিষ্টি চাও তৈরি হলো। ব্যাপক ভোজ খেয়ে সবাই খুশি! ভোজ শেষে ধূমপান আর বক্তৃতা পর্ব শুরু হলো।

আমার বক্তব্য ইন্ডিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে দিল রেনাল। ইন্ডিয়ানরা আমার প্রতিটি কথার প্রতিধ্বনি তুলে অনুমোদন ও সম্মতি জানাল।

'আমি বহু দূরের দেশ থেকে এসেছি', শুরু করলাম আমি, 'এত দূরে, তোমরা যে গতিতে ভ্রমণ কর তাতে আমার দেশে পৌছতে এক বছর সময় লেগে যাবে।'

আশ্চর্য হয়ে 'বেশ! বেশ!' বলে চেঁচাল ইন্ডিয়ানরা।

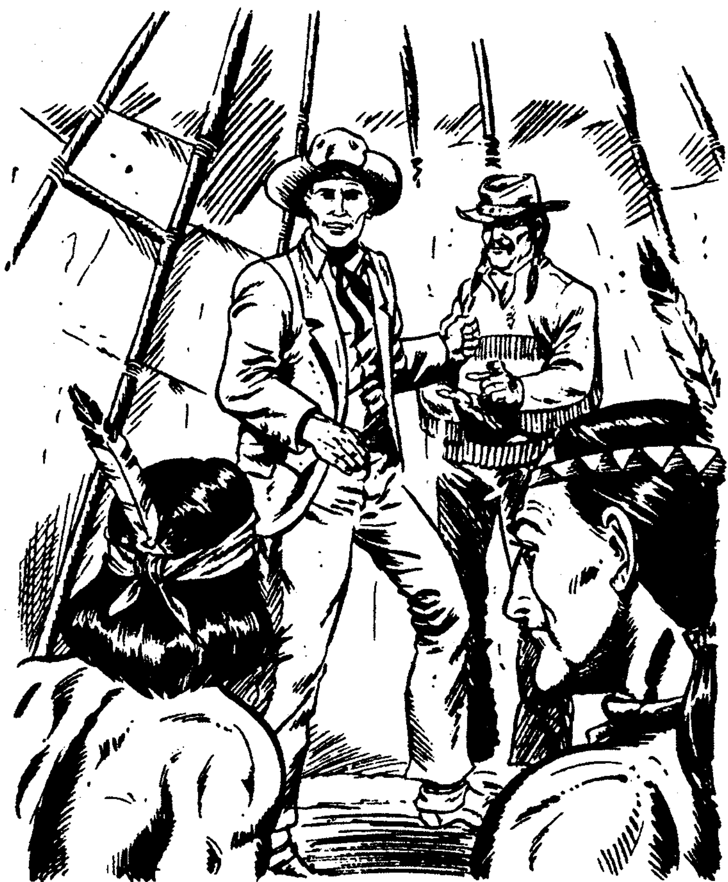
'ওখানে,' বলে চললাম আমি, 'যত সাদা মানুষ আছে, তত ঘাস প্রেইরীতেও নেই, আর তাদের সবাই সাহসী যোদ্ধা।'



একদিনে কুড়িটি বাড়ির দাওয়াত রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না

'বেশ! বেশ!'

'আমি সাদা মানুষদের বাড়িতে থাকার সময় ওগলালার কথা জানতে পারি। শুনেছি তারা খুব সাহসী জাতি, তারা শ্বেতাঙ্গদের খুব পছন্দ করে, তারা কীভাবে মোষ শিকার করে, শত্রুদের ওপর হামলা চালায়। আমি তাই দেখতে এসেছি, এসব কথা সত্যি কিনা...'



বাক্কা ইন্ডিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে দিল রেনাল

'বেশ! বেশ! বেশ! বেশ!'

'পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে আসতে হয়েছে বলে তেমন উপহার সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি নি। তবে ফোর্ট লারামিতে আমার অঢেল পাউডার, সিসা, ছুরি আর তামাক আছে। তোমরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে তামাক কেন তার তুলনায় ওগুলো অনেক ভাল। আমি দুর্গ থেকে চলে যাওয়ার আগে যদি ওখানে আস, তোমাদেরকে অনেক উপহার দিতে পারব।'



বুড়ো সর্দার লাল পানি দীর্ঘ বক্তৃতা দিল

একথা শুনে খুশিতে ঝলমল করে উঠল ওদের চেহারা।

এরপর বুড়ো সর্দার লাল পানি দীর্ঘ বক্তৃতা দিল। রেনাল তার বক্তৃতা অনুবাদ করে শোনাল আমাকে, 'আমি সব সময়ই সাদা মানুষদের পছন্দ করি। আমি মনে করি, তারাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তারা যে কোন কিছুই করতে পারে। তারা যখন আমাদের কুটিরে এসে থাকে, আমি খুবই খুশি হই। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনাদের ওগলালা

পছন্দ হয়েছে, না হলে কখনোই এত দূরের গ্রামে আসতেন না।' সে ভোজ উপলক্ষে একটা ধন্যবাদসূচক গান গেয়ে বলল, 'এবার সবাই চলো, সাদা মানুষদের একটু বিশ্রাম নিতে দাও।' এরপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল।

জানলাম যে, ওগলালার মানুষের তাঁবু খাটানোর জন্য পর্যাপ্ত পশুচামড়া ছিল না। পুরনোগুলো জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তাদের অনেক মোষের চামড়া থাকলেও ছাউনি খাটাবার পক্ষে ওগুলো খুব পুরু আর ভারী। ওদের দরকার গাভীর চামড়া। আর ওটা প্রচুর পরিমাণে মিলবে আরও পশ্চিমে মেডিসিন বো মাউন্টেনে, রকি পর্বতমালার কাছে। ওই অঞ্চলটা আবার এদের শত্রুপক্ষ সর্প গোষ্ঠীর শিকার এলাকা হলেও অবশ্য ওগলালারা যথেষ্ট সাহসী। তা ছাড়া এখন তাদের সাথে আছে তিন-তিনজন রাইফেলধারী শ্বেতাঙ্গ (রেনাল, রেমন্ড এবং আমি)। কাজেই ভয় কিসের?

অতএব আমরা ক্যাম্প তুলে যাত্রা শুরু করলাম পশ্চিম অভিমুখে। কয়েকদিনের পথ পরিক্রমা শেষে পৌছলাম শিকারের ভূমিতে। অগ্রগামী সন্ধানীরা জানাল ধারেকাছেই মোষের দেখা মিলেছে, পরের দিন শুরু হবে শিকার।

ওগলালা বন্ধুদের নিয়ে ধাওয়া করলাম ওগুলোকে। আমরা ৭০ জন মিলে ৫০০ গাভীর একটা পাল যখন ধাওয়া করছি, ওই সময় আরও ৩০ জন ইন্ডিয়ান আরেক পাশ দিয়ে হতভম্ব ও আতঙ্কিত আরেক পাল ষাঁড়ের ওপর হামলে পড়েছে। মোষের পাল ধুলোর পাহাড় তুলে ছোটাছুটি করছে। তাদের পেছনে সেঁটে রইল ঘোড়সওয়াররা।

ধুলোর মেঘ কেটে যাওয়ার পরে দেখতে পেলাম ইন্ডিয়ানরা ঘোড়া নিয়ে ভয়ানক গতিতে ছুটছে মহিষের পালের পেছনে। গলা ফাটিয়ে তারা চিৎকার করছে, সেইসঙ্গে ছুঁড়ছে তীর। একটার পর একটা মোষের দেহ তীরবিদ্ধ হয়ে ছিটকে পড়তে লাগল মাটিতে। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আহত গাভীগুলো, তাদের শরীরে পালক লাগানো তীর। ওদের



ক্যাম্প তুলে যাত্রা শুরু করলাম পশ্চিম অভিমুখে

পাশ দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে যাবার সময় ভাঁটার মতো ওদের চোখগুলো জ্বলে উঠল, বেড়ালের মতো গড়গড় করে দুর্বল ভঙ্গিতে তেড়ে এসে আমার ঘোড়াটাকে ঢুঁস দেয়ার চেষ্টা করল ওরা।

টানা পাঁচ দিন শিকার শেষে ইন্ডিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে মাংস এবং চামড়া জোগাড় করল। বেজায় খুশি তারা এখন। পাতলা ফালি করে কাটা হলো মাংস, তারপর দড়িতে গেঁথে দুটি ছাউনির মাথায় দড়িটাকে বেঁধে ঝুলিয়ে



ইন্ডিয়ানরা ঘোড়া নিয়ে ভয়ানক গতিতে ছুটছে মহিষের পালের পেছনে

রাখা হলো সূর্যতাপে শুকানোর জন্য। বাচ্চা-কাচ্চা, মহিলারা তাজা চামড়া মাটিতে ছড়িয়ে ওগুলো পরিষ্কার করতে লাগল, ওরা একদিকের চামড়া থেকে চুল আর অন্যদিকের চামড়া থেকে মাংসের টুকরা তুলে নিল। তারপর মোষের মগজ চামড়া ঘষে ঘষে এটাকে নরম করে নিল, যাতে সহজে ওটাকে ভাঁজ করা যায়। একসময় চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পূর্ণ হলো। এবার দরকার তাঁবু বানানোর জন্য মজবুত খুঁটি, কেবল ব্লাক হিলের লম্বা দেবদারু গাছ দিয়েই এই খুঁটি বানানো হয়।

২৫ জুলাই শোরগোলের শব্দে ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলা হলো। আবার



পাতলা ফালি করে কাটা হলো মাংস

সমভূমিতে ঘোড়ার পিঠে এবং পদব্রজে শুরু হলো যাত্রা। এবার আমরা পূর্বে ব্ল্যাক হিলসে যাচ্ছি।

দুই দিন পরে লম্বা দেবদারু গাছের অরণ্যে পৌঁছলাম। ইন্ডিয়ানরা গাছ কেটে, লাকড়ি বানিয়ে রোদে শুকাল। বেশ কয়েকদিন লেগে গেল একাজে। একদিন কালো পাহাড়গুলোর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে রেনাল মন্তব্য করল, 'ওই পাহাড়ে অঢেল সোনা আছে। তবে



দিন দুই বাদে পৌঁছে গেলাম লারামি খাঁড়িতে, চলে এলাম দুর্গে

ইন্ডিয়ানরা বলে ওখানে মন্দ আত্মারা বাস করে, তাই সাদা মানুষদের ওই পাহড়ে সোনা খুঁজতে যাওয়া বিপজ্জনক।'

বেশ কিছুদিন ধরে গাছ কাটা দেখতে দেখতে একঘেয়ে লাগছিল, যাত্রা শুরু হওয়াতে একঘেয়েমি কাটল আর দারুণ খুশি হলাম। ব্ল্যাক হিলসের মাঝ দিয়ে ফোর্ট লারামি মুখে চললাম। আমি কুইন্সিকে বলেছিলাম ১ আগস্ট ওখানে ওর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে দুর্গে পৌঁছানো সম্ভব হলো না, কারণ খাড়া পাহাড় আর অন্ধকার পাইনের জঙ্গল ঠেঙিয়ে

তখনও আমরা পথ চলছি, ফোর্ট লারামি তখনও দু দিনের রাস্তা। কুইন্সি উদ্বিগ্ন হবে ভেবে আশঙ্কা হচ্ছিল। কাজেই ওগলালা বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়ভোজ শেষে আমি আর রেমন্ড দুর্গের দিকে ছুটলাম।

দিন দুই বাদে পৌঁছে গেলাম লারামি খাঁড়িতে, চলে এলাম দুর্গে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল কুইন্সি। ওকে দেখে খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠলাম আমি।

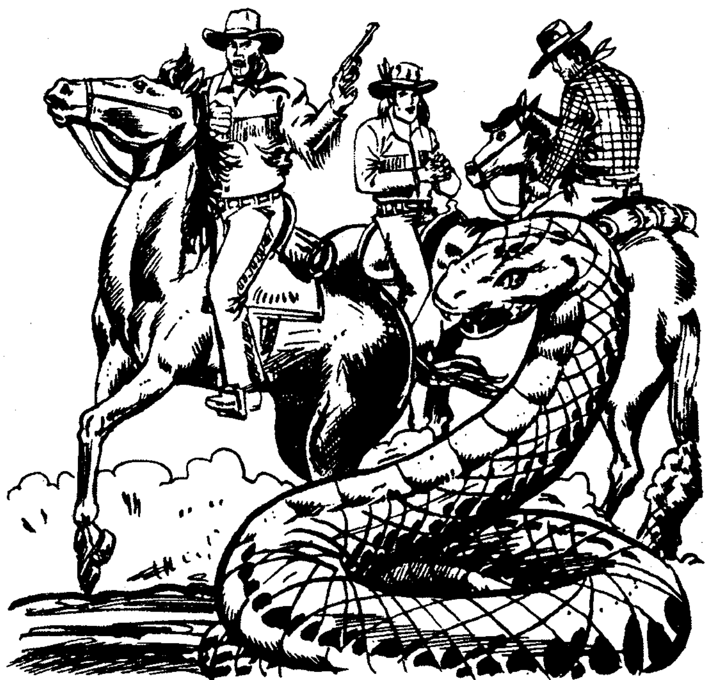


বাড়ি যাওয়ার জন্য দীর্ঘযাত্রা শুরু হলো ফোর্ট লারামি থেকে

১০. বাড়ির পথে

৪ আগস্ট বাড়ি যাওয়ার জন্য দীর্ঘযাত্রা শুরু হলো ফোর্ট লারামি থেকে। আমাদের রাস্তা হলো রকি পর্বতমালা থেকে আরকানসাস নদী অভিমুখে। এ অঞ্চলটিকে বিরান বললেই চলে। সবুজ বলতে শুকনো, খাটো ঘাস, সূর্যতাপে কুঁচকে গেছে। আমরা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে, পাইনের জঙ্গল ভেদ করে চলতে লাগলাম।

বিশালাকৃতির কালো এবং সবুজ রঙের ঝিঁঝিপোকা আমাদের রাস্তা থেকে সরে পড়ল, আর ঘাসফড়িং ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে মরল। ঘাসের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে লুকাল শত শত গিরগিটি, বড় বড় কালো কাঠবেড়ালি



র‍্যাটল স্নেক আমাদের দেখে হিস-হিস করে তেড়ে এলো

লাফ মেরে উঠল পাইনের ডালে। মানুষের কব্জির মতো মোটা র‍্যাটল স্নেক আমাদের দেখে হিস হিস করে তেড়ে এলো। প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে চার-পাঁচটা করে সাপ মারলাম।

যেসব প্রাণী পথে পড়ছিল, সেগুলোর চেয়ে আমরা বরং বেশি শঙ্কিত ছিলাম অচেনা কোন জাতির মানুষদের সাথে পথে দেখা হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে।

তিন সপ্তাহ পরে, ৪২৫ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে আরকানসাস নদীর তীরে, বেন্টস ফোর্টে পৌছলাম। শুনলাম ৬০০ মাইল দূরের উপনিবেশ অভিমুখে যাওয়া ট্রেইলটি এ মুহূর্তে বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। বহুসংখ্যক শত্রুভাবাপন্ন পনি এবং কোমাস্কি ইন্ডিয়ানরা ট্রেইলের কয়েক স্থানে জমায়েত হয়েছে। এতক্ষণ যে ভাগ্যদেবী আমাদের ওপর সুদৃষ্টি



দু'জন ক্যালিফোর্নিয়া ম্যান

রেখেছেন, তার ওপর ভরসা রাখলাম। রেমন্ড দুর্গেই আমাদের থেকে বিদায় নিল, সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা তিনজন ঝুঁকিটা নেব।

তবে দুর্গ ছাড়ার আগে চারজন লোক আমাদের দলে যোগ দিতে চাইল। এদের দু' জন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একপাল ঘোড়া নিয়ে এসেছে। তৃতীয় জন মিসৌরীর লোক, অরিগনের পথে অর্ধেকটা গিয়েও বাড়ির জন্য মন কেমন করায় মাবার ফিরে এসেছে। আর চতুর্থ বা শেষজন একজন সৈনিক, মেক্সিকোর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল; কিন্তু ব্রেইনফিভারে আক্রান্ত হয়ে আর যাওয়া হয় নি যুদ্ধে। বেন্টস ফোর্টে সে বাকি অসুস্থদের সঙ্গে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এখন অবশ্য সুস্থ হয়ে গেছে। আমরা এই চারজনকে

ডাকতাম 'ক্যালিফোর্নিয়া ম্যান' বলে। সানন্দেই ওদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম, ওরা যোগ দেয়ায় আমাদের দলটার শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।

২৭ আগস্ট দুর্গ থেকে উপনিবেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হলো। নিশ্চিতভাবেই আমাদের চেয়ে বেশি জরাজীর্ণ ও হতশ্রী পর্যটক দল আরাকানসাসের উজানভাগে এর আগে দেখা যায়নি। গত শরতে আমরা যে চমৎকার ও বিরাট ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলাম, সেগুলোর বদলে এখন আমরা চড়েছি নিচু জাতের প্রেইরী ঘোড়ায়। এগুলো খচ্চরের মতো কষ্টসহিষ্ণু আর দেখতে কুৎসিত। আমাদের খচ্চরগুলো শক্তিশালী এবং কষ্টসহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও প্রবল পরিশ্রমে ওগুলো ঝরঝরে হয়ে পড়েছে, ওরা দ্রুতই পায়ের ঘাতে আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের জিনগুলো ছিঁড়ে গেছে, যন্ত্রপাতি বাতিলপ্রায় আর অস্ত্রশস্ত্র জীর্ণ, জংধরা।

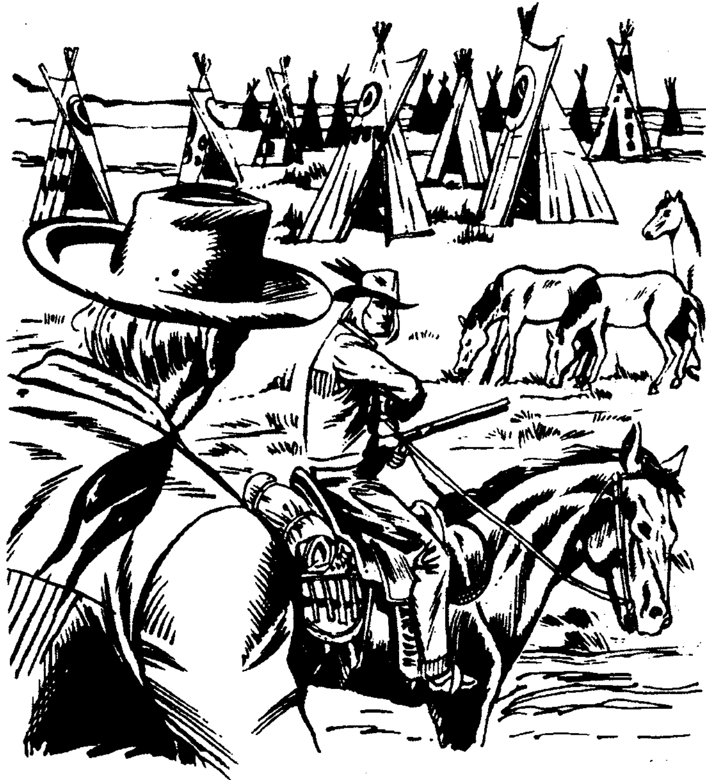
আমাদের জামা-কাপড়ের দশাও ভয়ানক, তবে কুইন্সি আর আমাকে সবচেয়ে উৎকট দেখাচ্ছিল। ওর পরনে পুরনো ফ্ল্যানেলের শার্ট, সামনের বোতাম নেই বলে বাতাসে উড়ছে, কোমরে বেল্ট দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে। আমার আর জামাটামা নেই বলে ছেঁড়া বাকস্কিনের একটা কোর্তা চাপিয়েছি গায়ে। আমাদের দেখতে ভিক্ষুকের মতোই লাগছিল, তার পরও আমরা পরোয়াহীনভাবে মনের খুশিতে একঘেয়ে ঐ আরাকানসাস নদীর তীর ধরে এগুলাম।

কিছুদিন পরে সান্তা ফে থেকে একটি কাফেলা এলো। এক ব্যবসায়ী জানাল, 'বাছারা, খারাপ খবর। সামনেই ইন্ডিয়ানরা ওঁৎ পেতে আছে। এরা আমাদের ক্যাম্পে প্রতিদিন হামলা চালাত। তোমাদের এক সপ্তাহ আগে বেন্টস ফোর্ট ছাড়া একটা দলের ওপর হামলা চালিয়ে ম্যাসাচুসেটসের এক লোককে হত্যা করেছে। তাকে বন্ধুরা কবর দিয়েছিল। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা কবর খুঁড়ে লোকটার লাশ বের করে খুলির চামড়া তুলে নেয়, বাকিটা সাবাড় করে নেকড়েরা। বলতে ভুলেই গেছি, ভাল খবরও আছে– সামনে আছে অগুনতি মোষ।



ইন্ডিয়ানরা হামলা চালিয়ে ম্যাসাচুসেটসের এক লোককে হত্যা করেছে

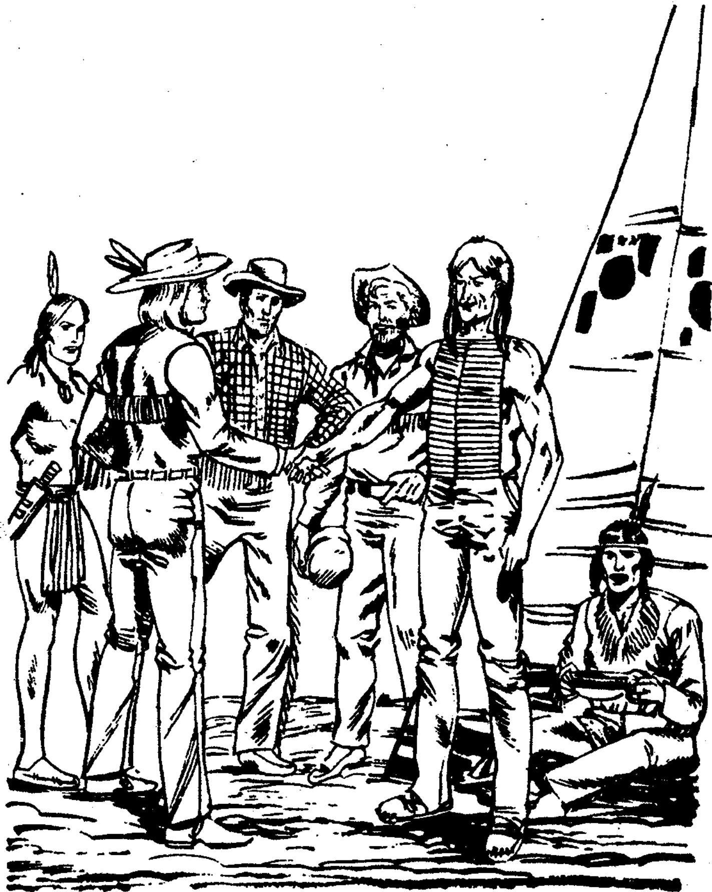
পরদিন আরেকটি কাফেলা দেখতে পেলাম, এটাও সরকারি, সৈন্যদের জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছে। চালকরা বলল, আরেকটু সামনে নদীর তীরে আরাপাহো ইন্ডিয়ানরা ক্যাম্প করেছে। ওরা লোক ভাল বলেই সবাই জানে, ষাড়ের পাল নিয়ে যাওয়া জনাত্রিশেক লোকের বাহিনীর সাথে আমাদের মতো গোটাকতক লোকের ঘোড়া আর খচ্চর নিয়ে যাত্রার বিস্তর ফারাক– ইন্ডিয়ানদের কাছে ষাঁড় মূল্যহীন, কিন্তু ঘোড়া আর খচ্চর রীতিমতো উস্কানিমূলক।



বিকেল নাগাদ আরাপাহো ইন্ডিয়ানদের ক্যাম্প দেখতে পেলাম

পরদিন বিকেল নাগাদ আরাপাহো ইন্ডিয়ানদের ক্যাম্প দেখতে পেলাম। নদীর অপর তীরে ঘাসে ছাওয়া তৃণভূমিতে কমপক্ষে দুশ কুটির। নদীর দু ধার ধরে মাইলখানেক জায়গাজুড়ে কমপক্ষে দেড় হাজার ঘোড়া আর খচ্চর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরাকানসাস নদীর ধারে আরাপাহোদের সাক্ষাতের সাথে পাহাড়ে ওদের আবাসভূমিতে সাক্ষাতের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কিন্তু আমাদের কপাল ভাল যে, কয়েক সপ্তাহ আগে সেনাবাহিনী তাদের পাশ দিয়ে গিয়েছে, জেনারেল যাওয়ার সময় আরাপাহো ইন্ডিয়ানদের সাবধান করে দিয়েছে, তারা যদি কোন শ্বেতাঙ্গের কেশাগ্রও স্পর্শ করে, তা হলে গোটা



সর্দার বেরিয়ে হাত মেলাল

গোত্রটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এটা অল্প সময়ের জন্য হলেও ওরা সমঝে চলতে শেখে, আর জেনারেলের হুঁশিয়ারির প্রভাব তখনও কাটেনি।

কাজেই অন্যরা যখন রাত নামার আগেই সন্দেহজনক প্রতিবেশীদের থেকে যতটা পারা যায় দূরে সরে গেল, কুইন্সি, হেনরী আর আমি নদী পার হয়ে আরাপাহোদের ক্যাম্পে বেড়াতে গেলাম।

প্রথম ইন্ডিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়ামাত্র হেনরী ইশারায় বোঝাতে চাইল, আমরা আরাপাহোদের গ্রাম দেখতে এসেছি। সাপের মতো ক্ষুদে চোখ মেলে আমাদেরকে দেখল ইন্ডিয়ানটা, কাঁধে মহিষের আলখাল্লা ঠিকঠাকমতো বসিয়ে নিঃশব্দে আমাদের নিয়ে চলল তার গাঁয়ের পথে।

আরাপাহোদের গ্রাম সব দিক দিয়ে সিওক্সদের মতোই, কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টা বাদে। উঠোন এখানে মোষের মাংস স্তূপ করা। ঘোড়ায় চড়ে সর্দারের কুটিরের দিকে যাওয়ার সময় শত শত ইন্ডিয়ান তাদের কুটির থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে লাগল আমাদের। আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বসলাম সর্দারের কুটিরের সামনে। কোলে রাইফেল, হাতে ঘোড়ার লাগাম। আমাদেরকে দ্রুত ঘিরে ফেলল অসভ্য চেহারার ইন্ডিয়ানদের পুরু একটা দেয়াল, এদের আকৃতি ও গায়ের রং সিওক্সদের থেকে একেবারেই আলাদা।

তালগাছের মতো লম্বা, দেখতে ইতরপানা আর পেশিবহুল শরীরের সর্দার বেরিয়ে এলো কুটির থেকে। হাত মেলাল আমাদের সঙ্গে। বউকে কী একটা নির্দেশ দিতে সে এক বাটি মাংস নিয়ে হাজির হলো। তবে অবাক ব্যাপার, ধূমপানের পাইপ এলো না।

প্রথা অনুযায়ী কিছু মাংস মুখে তুলতে হলো। এরপর উপহারের ডালি খুললাম আমি। ওদের একটা ঢাল নিতে চাইলাম। যে দেবে বিনিময়ে তাকে বড় একটা লাল কাপড়, তামাক এবং একটা ছুরি দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম, আরাপাহোদের কাছে ঢালের মূল্য অনেক, বংশ পরম্পরায় পিতা তার ঢাল দিয়ে যায় পুত্রকে। আমার জন্য চলনসই একটি ঢাল নিয়ে আসা হলো। জানতে চাইল ঢাল দিয়ে কী করব। হেনরী ইশারায় জবাব দিল। ফলাফল হিসেবে আরাপাহোরা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলে আমি হেনরীর কাছে জানতে চাইলাম, ও কী বলেছে।

'কী আর বলব?' জবাব দিল হেনরী, 'বলেছি, এ ঢাল দিয়ে আমরা আরাপাহোদের জানের দুশমন পনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

আমরা ওদেরকে আরও নানান উপহার দিলাম। সবার চোখ লোভে



আমরা ওদেরকে নানান উপহার দিলাম

চকচক করছে, মুখে হাসি আর ধরে না, সবাই লম্বা-পাতলা উৎসুক হাত বাড়িয়ে দিল উপহার নেয়ার জন্য।

ওই রাতের পরে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। রাতে আমাদের ভাল ঘুম হয়নি হাজার নেকড়ের ডাকে। এগুলো আরাপাহোদের ছাউনির মাংসের ঝুটের লোভে এসে জুটেছে। কাছেই আরও বিপজ্জনক মানব-নেকড়েদের ভয়ে সারা রাত আমরা রাইফেল আকড়ে ধরে থাকলাম।



হাজার হাজার মোষ চোখে পড়ল

১১. বুনো মোষ শিকার

পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছি, হাজার হাজার মোষ চোখে পড়ল– মর্দা, মাদী আর বাছুর। নদীর দূর প্রান্তে, প্রেইরীর দিগন্তরেখা কালো হয়ে আছে তাদের বিচরণে। কোথাও কোথাও মোষের দল এমন ঘনভাবে, পিঠে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে তাদের পেছনটা মিলেমিশে একটা কালো স্তরের মতো মনে হচ্ছিল। কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে



তেসলারিয়েস তাজা মাংস ফালি করে শুকোতে দিল

জানোয়ারগুলো, কোথাও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ধুলো ওড়াচ্ছে। গায়ে গা ঘষছে, শিংয়ে শিং, হাঁক ছাড়ছে কর্কশ গলায়। এরকম একটা লোভনীয় দৃশ্যে যা করণীয় তাই করলাম আমি আর কুইন্সি। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মোষ শিকারে।

পরবর্তী কয়েকদিনে অনেকগুলো মোষ শিকার করলাম। মহিষের কাটা লেজ নিয়ে আসতাম বিজয়ের স্মারক হিসেবে, আর পুড়িয়ে কাবাব বানাতাম জিভ এবং রসাল কুঁজের মাংস কেটে।



শিকার আমরা এত ভাল পেতে লাগলাম যে, আমরা ঠিক করলাম সীমান্তে যাওয়া পর্যন্ত যেতে প্রয়োজনীয় মাংস শুকোতে যতদিন লাগে, ততদিন আমরা ক্যাম্প ভাঙব না– ওই পর্যন্ত যেতে আমাদের হিসেবে প্রায় এক মাস লাগবে। আমরা ক্যাম্প করলাম নদীর ধারে– অবশ্য বালুর ওপর দিয়ে বহমান সরু জলের ঐ ধারাটাকে আদৌ 'নদী' নামে ডাকাটা সঙ্গত হয়।

ডেসলরিয়ের্স তাজা মাংস ফালি করে শুকোতে দিল। ও ইন্ডিয়ান বউদের মতই দক্ষ এ কাজে। খুব চমৎকার করে মাংসের ফালি করে। দ্রুতই চামড়ার দড়ি বাঁধা হলো ক্যাম্পের চারিধারে, আর ওই দড়িতে ঝুলিয়ে প্রেইরীর বিশুদ্ধ বাতাস আর সূর্যের আলোতে মাংস শুকাতে দেয়া হলো।

ডেসলরিয়ের্সকে আমরা মাংসের যোগান দেয়া অব্যাহত রাখলাম, কেননা



রানিং পদ্ধতি প্রধান সমস্যা ছুটতে ছুটতে বন্দুক বা পিস্তলে গুলি ভরা

মোষ শিকারের দুটো পদ্ধতিই আমরা ততদিনে দক্ষতার সাথে রপ্ত করে ফেলেছি, কাজেই আমাদের মাংসের কোনো অভাব ছিল না। প্রথমটি হলো ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহিষের পালকে ধাওয়া করা, এর নাম 'রানিং'। দুই পদ্ধতির মধ্যে এটি বেশি উত্তেজনাকর ও ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে মোষ যখন তিরিক্ষি মেজাজে থাকে। অন্যদিক দিয়ে কিন্তু এই পদ্ধতিটা বেশ সহজও, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিকারি ভাল ঘোড়ায় চেপে ছত্রভঙ্গ মোষের পালের ভেতর দিয়ে ছুটে গুলি ভরতে ভরতে এক ধাওয়াতেই পাঁচ থেকে ছটা মোষ ফেলে দিতে পারে। সাহসী এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া থাকলে ছুটন্ত মহিষের একদম কাছে চলে যাওয়া যায়, পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে তাদের গা স্পর্শ করাও সম্ভব। এটা বিপজ্জনক কিছু নয়– যতক্ষণ মোষের শক্তি ফুরিয়ে না আসে।

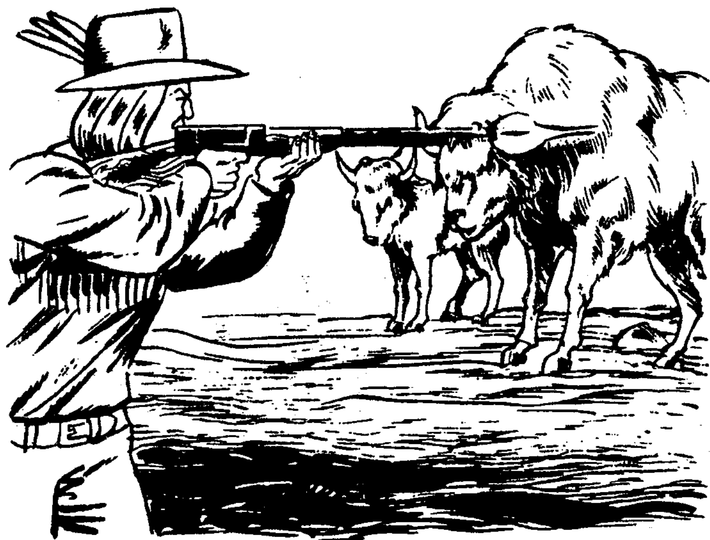
কিন্তু ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়া মোষ যখন দৌড়ে পালাবার ক্ষমতা হারায় আর মোষের মুখ থেকে যখন জিভ বেরিয়ে যায়, ফেনা বেরুতে থাকে চোয়াল দিয়ে, তখন এদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই ভাল। কারণ এ সময় বেপরোয়া মোষ চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিকারির ওপর হামলা চালিয়ে বসতে পারে। ঘোড়া তখন লাফিয়ে পাশে সরে যায়, শিকারিকে তার জিনের ওপর ঠিকঠাকমতো সামলে বসতে হয়, কেননা একবার ছিটকে পড়লেই– চিরবিদায়, শিকারি!

রানিং পদ্ধতিতে শিকারের প্রধান সমস্যা হলো পূর্ণগতিতে ছুটতে ছুটতে বন্দুক বা পিস্তলে গুলি ভরা। কাজটা সহজে করার জন্য অনেক শিকারিই মুখে তিন-চারটা বুলেট রাখে। ইন্ডিয়ানরা ছুটন্ত মোষ শিকারে তীর-ধনুক ব্যবহার করে, এটা আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে সুবিধাজনক। অনেক শ্বেতাঙ্গও মোষ শিকারে তীর-ধনুক ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো পায়ে হেঁটে শিকার, 'অ্যাপ্রোচিং'। শিকারি প্রেইরী ডগদের গর্তে ঘোড়ার ঠ্যাং ভাঙার সম্ভাবনা এড়াতে এবং এভাবেও নিজের জানটাকেও ঝুঁকির মাঝে ফেলতে না চাইলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। তবে এক্ষেত্রে শিকারিকে ঠাণ্ডা মাথার ও সদাসতর্ক হতে হবে। তাকে বুঝতে হবে মোষের মতিগতি, অঞ্চলের প্রাকৃতিক কাঠামো, বাতাসের গতিপ্রকৃতি আর রাইফেল চালনায় তাকে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে।

মোষ বড় অদ্ভুত প্রাণী। মাঝে মাঝে এরা খুব বোকার মতো আচরণ করে। খোলা প্রেইরীতে গদাই লস্করী চালে এমনভাবে হেঁটে বেড়ায় যে কেউ তাদের দৃষ্টিসীমার মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের শিকার করতে পারে, আর গোটা কয়েক মোষ মাটিতে গড়াগড়ি খাবার আগে বাকিরা পালাবার কথা ভাবেই না। কিছু সময় এরা এতই লাজুক হয়ে ওঠে যে তাদের দেখা পাবার জন্য চূড়ান্ত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে।

আমার বিবেচনায় বিখ্যাত শিকারি ও পথপ্রদর্শক কিট কারসন 'রানিং' পদ্ধতিতে মোষ শিকারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর 'অ্যাপ্রোচিং'-এর বেলায় হেনরী শ্যাতিলনই সেরা। মোষের মতিগতি হেনরী তেমনভাবে রপ্ত করেছে, যেমনভাবে পণ্ডিত তার পাঠ্যপুস্তককে রপ্ত করে– আর কাজটা



অ্যাপ্রোচিং-এর বেলায় হেনরী শ্যাতিলনই সেরা

হেনরী চরম আনন্দের সাথেই করেছে। মোষেরা এক অর্থে তার সহচর, আর যেমনটা সে বলে থাকে, মোষেরা ধারেকাছে থাকলে সে কখনও একা বোধ করে না।

দিনে দুই বার– সূর্যোদয় এবং দুপুরে মোষের পাল পাহাড় থেকে নেমে আমাদের ক্যাম্পের কাছের নদীতে পানি খেতে আসে। যে রাস্তা ধরে ওরা নদীতে আসে, আমরা সেখান থেকে কুড়ি গজ দূরে ঘাপটি মেরে বসে থাকি। মোষ যখন পানি পান করছে গরগর শব্দে, নিঃশব্দে বন্দুক তাক করি আমরা। তারপর মোষের কাঁধ লক্ষ্য করে রাইফেল তুলি। ট্রিগারে চেপে বসে আমাদের আঙুল।



মোষ যখন পানি পান করছে, তখন নিঃশব্দে বন্দুক তাক করি

মাটিতে, লাফ মেরে সামনে বাড়ে। কিন্তু বেশি দূরে যেতে পারে না। থেমে যায় সে। টলতে থাকে। ভাঁজ হয়ে যায় হাঁটু, দড়াম করে আছড়ে পড়ে বালুতে। গড়াগড়ি খায় কয়েকবার। তারপর স্থির হয়ে যায় বিশাল শরীরটা।

মোষদের এভাবে লুকিয়ে থেকে শিকার করা খুবই সহজ। তবে খাদ বেয়ে উঠে, পাহাড়ের আড়াল থেকে কিংবা খোলা প্রেইরীতেও কখনও কখনও ওদেরকে সহজে শিকার করা যায়।



মোষদের এভাবে লুকিয়ে থেকে শিকার করা খুবই সহজ

অন্য সময় কিন্তু মোষ শিকার খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তখন দক্ষ শিকারির চাতুর্য এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়। হেনরী শ্যাতিলন তেমনই সাহসী এবং শক্তিমান একজন শিকারি। কিন্তু মাঝে মাঝে ওকেও আমি শিকার থেকে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ফিরতে দেখেছি। শরীরে নানান জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে বেয়াড়া মহিষের শিংয়ের গুঁতোয়।

এই ক্যাম্পে আমাদের দ্বিতীয় দিনে হেনরী একদিন দ্বিপ্রাহরিক শিকারে বেরুল। কুইন্সি আর আমি পেছনে রইলাম, কিন্তু কিছু মোষকে নদীর অন্য পাড়ে পানি খেতে আসতে দেখে আমরা রাইফেল, বুলেটের থলে আর পাউডারভর্তি শিঙা নিয়ে বেড়িয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

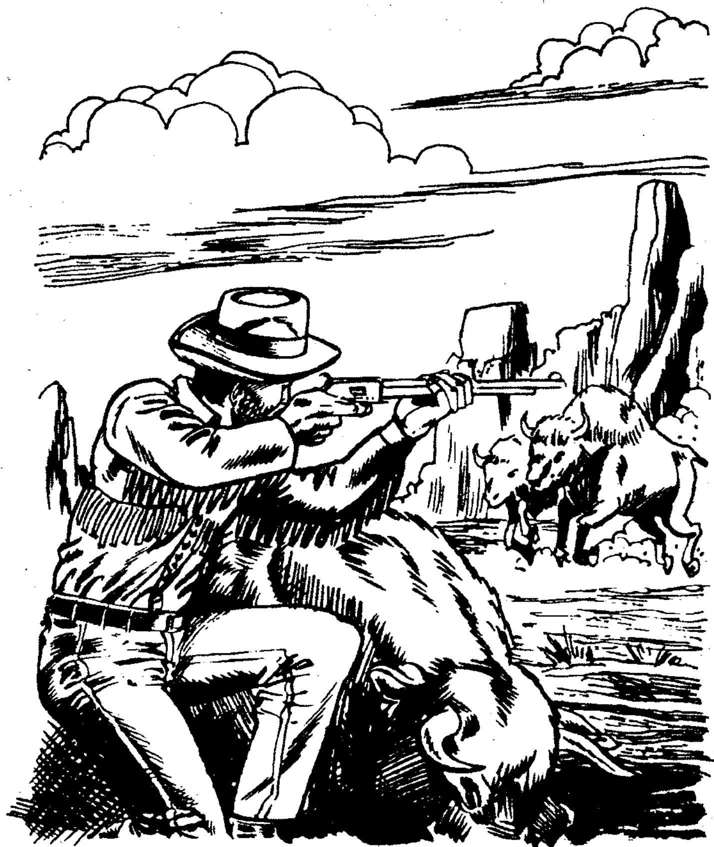
এদিকে পানির গভীরতা দুফুটের বেশি নয়। আমরা নদী পার হচ্ছি, এমন



মোষগুলো স্থির দৃষ্টিতে ঘাসের মধ্যে অদ্ভুত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল

সময় মোষের দল দেখে ফেলল আমাদেরকে। দ্রুত ছুটতে লাগল। আমি হুড়মুড় করে উঠে এলাম তীরে। ধাওয়া করলাম ওদেরকে। ওরা গুলির নাগালের ভেতর প্রায় চলে এসেছে, এমনি সময় ওরা ধীরগতিতে ঘুরল আমার দিকে। ওরা পুরোপুরি ঘুরে আমাকে ভাভাবে দেখতে পাবার আগেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। মোষগুলো স্থির দৃষ্টিতে ঘাসের মধ্যে অদ্ভুত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঘুরল ওরা, আগের মতো হাঁটা দিল।

সিধে হলাম আমি, ধাওয়া করলাম আবার। আবার ঘুরল ওরা এবং যথারীতি আমিও শুয়ে পড়েছি মাটিতে। এভাবে তিন-চার বার করলাম



পছন্দমতো মোষ বেছে নিয়ে নিশানা ঠিক করে

কাজটা। অবশেষে একশ গজ দূর থেকে আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে বড় মোষটাকে গুলি করলাম। ওটাও তক্ষুনি কুপোকাৎ।

মোষগুলোকে যখন ধাওয়া শুরু করেছিলাম, তখনকার প্রায় ফাঁকা প্রেইরী ততক্ষণে অসংখ্য মোষে সয়লাব হয়ে পড়েছে। ডানে-বামে-সামনে চারিদিকে শুধু মোষ আর মোষ। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো একের পর এক গুলির শব্দ: গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম।

মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম আমি কে গুলি করছে দেখতে।

বেশি দূর যেতে হলো না, দেখলাম গুলি ছুঁড়ছে হেনরী। অবাক হয়ে দেখলাম প্রেইরীর মাঝে একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গুলি করছে সে, চতুর্দিকে তাকে ঘিরে রেখেছে মোষেরা। মনে হলো যেন নিজের বাড়িতে আছে হেনরী।

হেনরী শিকারে এত মগ্ন যে টেরই পেল না তার দিকে কেউ তাকিয়ে আছে; তার দীর্ঘ শরীরটা একদম সটান, তার চোখ দুটো মোষের ওপর থেকে সরছে না মোটেই। পছন্দমতো মোষ বেছে নিয়ে নিশানা ঠিক করে সেটাকে মেরে ফেলছে সে, এটা দেখে খেলার মতো মনে হলো আমার।

মোষগুলো কিন্তু তার দিকে কোন নজরই দিল না, যেন সেও তাদের মতোই একটা মোষ। একটার পর একটা জানোয়ার ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, মরা গরুর পাশে গিয়ে কেউ কেউ লাশের গন্ধ শুঁকছে, কয়েকটা বৃদ্ধ মোষ মুখ তুলে নির্বোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল হেনরীর দিকে। কিন্তু কেউ ওকে হামলার চেষ্টা করল না, কিংবা পালিয়েও গেল না।

আমি এই অভূতপূর্ব দৃশ্য কিছুক্ষণ হাঁ করে দেখলাম। শেষে সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম হেনরীর কাছে, মৃদুগলায় ওর নাম ধরে ডাকলাম।

হেনরী ঘুরে শান্তগলায় বলল, 'দাঁড়িয়ে পড়ো, চলে এসো।'

ওর কথামতো সিধে হলাম আমি। কিন্তু আমাকে দেখেও ভয় পেল না মোষের দল। তারা মৃত সঙ্গীদের ঘিরে থাকল। আমাদের যতগুলো মোষ দরকার, হেনরী প্রায় তত পশুই শিকার করে ফেলেছে, আর আমি মৃতদেহগুলোর পেছনে উবু হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার আগেই আরও পাঁচটা মদ্দা মোষ শিকার করলাম।

দিন চারেক বাদে আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। সঙ্গে আছে আট-নয়টা গাভীর সেরা অংশগুলো থেকে বাছাই করা ৮০০ পাউণ্ড শুকনো মাংস। প্রতিটা গাভী থেকে সামান্য অংশই নিয়েছি, বাকিটা ফেলে এসেছি নেকড়েদের জন্য।

প্রেইরীর মাটিতে গনগনে সূর্যের নিচে পড়ে থাকা মোষের মৃত দেহ টেনে আনল নেকড়ের দল। এলো বিশাল আকারের লাল চোখের ধূসর আর



পড়ে থাকা দেহগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে গেল প্রেইরী নেকড়ে, স্প্যানিয়েল কুকুর ও শকুনের মধ্যে

সাদা নেকড়ে, আরও এলো স্প্যানিয়েল কুকুরের চেয়ে সামান্য বড় প্রেইরী নেকড়ে। পড়ে থাকা দেহগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে গেল তাদের মধ্যে। আকাশে টার্কি ব্যাজার্ড আর কালো শকুনের ওড়াওড়ি। অপেক্ষায় আছে নেকড়েরা চলে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে উচ্ছিষ্টের উপর।

আমরা যখন আমাদের পূর্বমুখী যাত্রা পূনরায় শুরু করলাম, আশেপাশের এলাকায় নেকড়েরা পাল বেঁধে ঘুরে বেড়াল, আকাশে মেঘের স্তরের মতো শকুনেরা। ওদের ভোজে বাধা দেবে না কেউ।



চলার সময় অনেক মিসৌরী সৈনিকদের সাথে দেখা হলো

১২. আরকানসাস নদীর তীর ধরে

আরকানসাস নদীর তীর ধরে চলেছি। চলার সময় অনেক মিসৌরী সৈনিকদের সাথে দেখা হলো। এরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে চলেছে জেনারেল কিয়ার্নির সেনাবাহিনীর মেক্সিকোর সান্তা ফে দখলের অভিযানের সঙ্গে যোগ দিতে। সৈন্যরা রুক্ষ-কঠোর হলেও সুদর্শন। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুট পরেছে তারা, কোমরে তরবারি এবং পিস্তল। সেইসঙ্গে আছে স্প্রিং ফিল্ড রাইফেল।



যতগুলো সৈন্যদলের সঙ্গে দেখা হলো, সবারই শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন

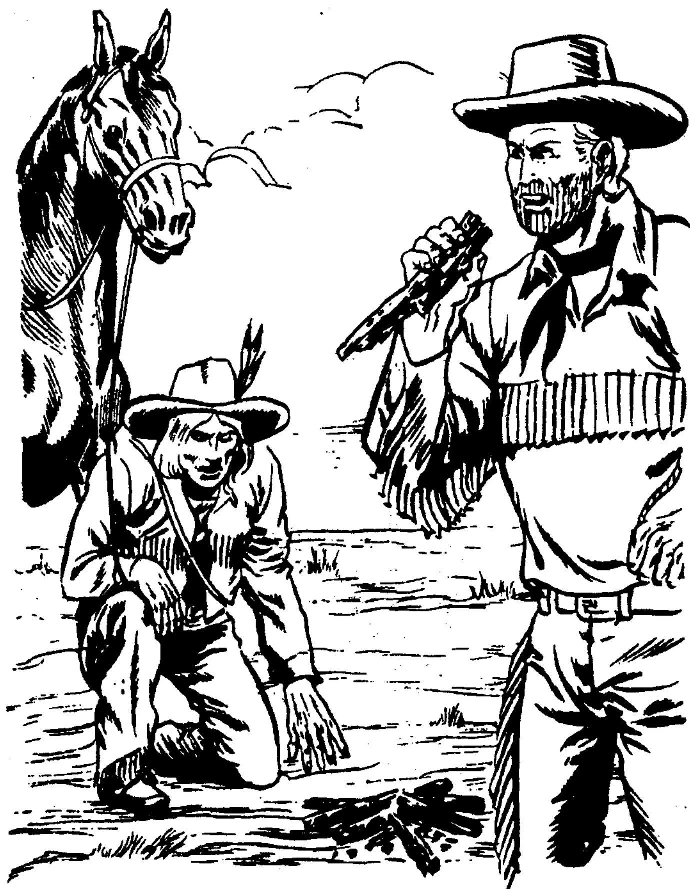
‘কেমন আছেন আপনারা?’ জিজ্ঞেস করল একজন।

‘যাচ্ছেন কোথায়?’ জানতে চাইল আরেকজন।

‘কোথায় থাকেন আপনারা, বাড়ি যাবেন কবে?’ তৃতীয় জনের প্রশ্ন।

‘আপনারা নিশ্চয় ব্যবসায়ী?’ অনুমান করে চতুর্থ জন।

‘সামনে আরও মোষ আছে নাকি?’ আরেকজনের কৌতূহল।


সাম্প্রতিক আগুন জ্বালানোর চিহ্ন দেখতে পেলাম

'আমাদের ঘোড়া সান্তা ফে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে তো?' আরও একজনের জিজ্ঞাসা।

যতগুলো সৈন্যদলের সঙ্গে দেখা হলো, সবার একই প্রশ্ন। জবাব দিতে দিতে শেষে রীতিমতো বিরক্তির সীমা পার হয়ে গেল। আমাদের উত্তরও ক্রমাগত সংক্ষিপ্ত হতে হতে শেষমেশ 'হ্যাঁ-হুঁ'র মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। ওরাও হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেদের রাস্তা ধরলে স্বস্তি মিলত।

এদিকে মোষের অভাব নেই, শিকারও আমরা করলাম মন ভরে। তবে আমাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হলো, কারণ এটা পনি ইন্ডিয়ানদের এলাকা। কার্তুজ বা গানপাউডারবিহীন অবস্থায় ধরা পড়েও কোন লাভ নেই।

সকল রকম সতর্কতাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা কোন ত্রুটি করলাম না। রাতে ঘুমাবার সময় পালা পাহারা বসানো হলো, কেউই রাইফেল পাশে না নিয়ে ঘুমুত না।

একদিন সকালে বড় একটি ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের নিশানা চোখে পড়াতে আমাদের সতর্কতা বেড়ে গেল। হেনরী ওটা ভালভাবে দেখে মন্তব্য করল, 'কোমাঞ্চি। সপ্তাহ খানেক আগের।'

ওরা আশপাশে নেই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় আবার সাম্প্রতিক আগুন জ্বালানোর চিহ্ন দেখতে পেলাম। ছমছম করে উঠল গা।

'দ্য ক্যাচেস' নামে একটি জায়গায় পৌঁছে আমাদের ভয় আরও বেড়ে গেল। খুবই বিপজ্জনক জায়গা এটি। জায়গাটা দেখতেও ভয়ানক। এখানে ওখানে-বালুর পাহাড়, গভীর খাদ। ম্যাসাচুসেটস থেকে আসা অভিবাসীদের কয়েকটি কবরও চোখে পড়ল, খুন হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। পনিদের কাণ্ড সম্ভবত।

'সাবধানে থাকবে সবাই!' বলল হেনরী। 'চারদিকে সতর্ক নজর রেখে চলবে।' আমরা দ্রুত ঘোড়া ছোটালাম।

সেপ্টেম্বরের চৌদ্দ তারিখে বিশাল একটি রসদবোঝাই কাফেলা চোখে পড়ল, সান্তা ফে যাচ্ছে। পুরোটা সমভূমিজুড়ে সারিবাঁধা সাদা-চুড়ো মালবাহী গাড়ি, কালো যাত্রীবাহী গাড়ি– ওগুলোতে ভ্রাম্যমাণ বণিকেরা দিব্যি ঘুমিয়েও নিতে পারে ঘোড়া আর খচ্চরের বিশাল পাল, আর অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকজন। ওরা যখন আমাদের কাছে দাঁড়াল, আমাদের দীন-হীন গাড়ি আর জরাজীর্ণ লোকজন– সব মিলে ওই সরগরম কাফেলার পাশে রীতিমতো নগণ্য লাগল।



বিশাল একটি রসদবোঝাই কাফেলা চোখে পড়ল, সান্তা ফে যাচ্ছে

এক ব্যবসায়ী সাবধান করে দিল, 'বেঘোরে মারা পড়তে না চাইলে নদীর তীরের মূল ট্রেইলের দিকে যাবেন না।'

এদিকে বাঁক নিয়েছে নদী। আমরা অপেক্ষাকৃত ছোট ট্রেইল ধরে সরাসরি প্রেইরী চিরে এগোলাম, রাস্তাটা ৬০-৭০মাইল।।

পরদিন রাতে আমার গায়ে আবার ব্যথা উঠল। আবার অসুস্থ বোধ



হেনরী, একটু বাইরে এসো

করছি। সেদিন বেশ বৃষ্টিও হলো। সারা রাত তাঁবুতে পানি চঁইয়ে আমার যন্ত্রণা আরেকটু বাড়িয়ে তুলল।

কুইন্সি আর এক ক্যালিফোর্নিয়া ম্যান বৃষ্টি আর নিকষকালো সেই অন্ধকারে পাহারায় ছিল। মাঝরাতে ঘণ্টা দুই বাদে কুইন্সি ঢুকল তাঁবুতে, হেনরীর কাঁধ স্পর্শ করে নিচুগলায় বলল, 'হেনরী, একটু বাইরে এসো।'



নেকড়েরা এত কাছে আসার পরও ঘোড়াগুলো শব্দ করল না

'কী হয়েছে?' লাফিয়ে উঠে বসলাম আমি।

'সম্ভবত ইন্ডিয়ান,' ফিসফিস করল কুইন্সি, 'তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো। লড়াই হলে তোমাকে ডাকব।'

হেনরী আর ও বাইরে গেল। আমি রাইফেল প্রস্তুত করে রাখলাম। কিন্তু শরীর ব্যথাটা এমন অসহনীয় হয়ে উঠল, শুয়ে পড়তে হলো। পাঁচ মিনিট পরে ঢুকল কুইন্সি।

‘সব ঠিক আছে,’ বলল সে। আমার পাশে শুয়েই নাক ডাকতে লাগল। হেনরী এখন তার জায়গায় পাহারা দিচ্ছে।

সকালে কুইন্সি রাতের ঘটনা জানাল: ‘ক্যালিফোর্নিয়া ম্যানদের একজন অন্ধকারে ঘোড়াগুলোর পেটের নিচে কিছু আকৃতি দেখেছে, যেগুলো দেখলে মনে হবে কেউ চুপিসাড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে। আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে এগিয়ে ওদের দেখার চেষ্টা করি। ওগুলো দেখে ইন্ডিয়ান বলেই মনে হলো। তাই হেনরীকে ডেকেছি, তুমি তো জানোই পুরো প্রেইরীতে হেনরীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লোক কমই আছে। ওই আকৃতিগুলো কী তা বুঝতে ওর মোটেই সময় লাগেনি। বুঝলে ফ্রান্সিস, ওগুলো আসলে ছিল নেকড়ে!’

‘আজব,’ অবাক হলাম আমি, ‘নেকড়েরা ওদের এত কাছে আসার পরও ঘোড়াগুলো শব্দ করল না!’

‘হেনরী আমাকে বলল যে নেকড়েগুলো নাকি ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখা চামড়ার দড়িগুলো চিবুতে চাইছিল।’ ব্যাখ্যা করল কুইন্সি।

‘তাই তো! এবার বুঝলাম আগেও ক-বার ঘোড়ার দড়ি দু টুকরো অবস্থায় পাবার কারণ, নেকড়ে!’ একটা রহস্য সমাধানে আনন্দিত আমি।

পরদিন আমরা একটা নদীর ধারে এলাম। যাত্রার প্রায় পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। আমাদের প্রায় প্রতিদিনই সরকারি সরবরাহ গাড়ির সারি চোখে পড়ছে। শামুকের গতিতে তারা সেনাবাহিনীর জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছে সান্তা ফে-তে।

কাউ ক্রিকে প্রচুর আঙুর আর আলুবোখারা গাছ দেখতে পেলাম। লিটল আরকানসাস রিভারে দেখা মিলল শেষ মোষটির। বুড়ো মোষটি বিষণ্ন চেহারা নিয়ে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রেইরীতে।

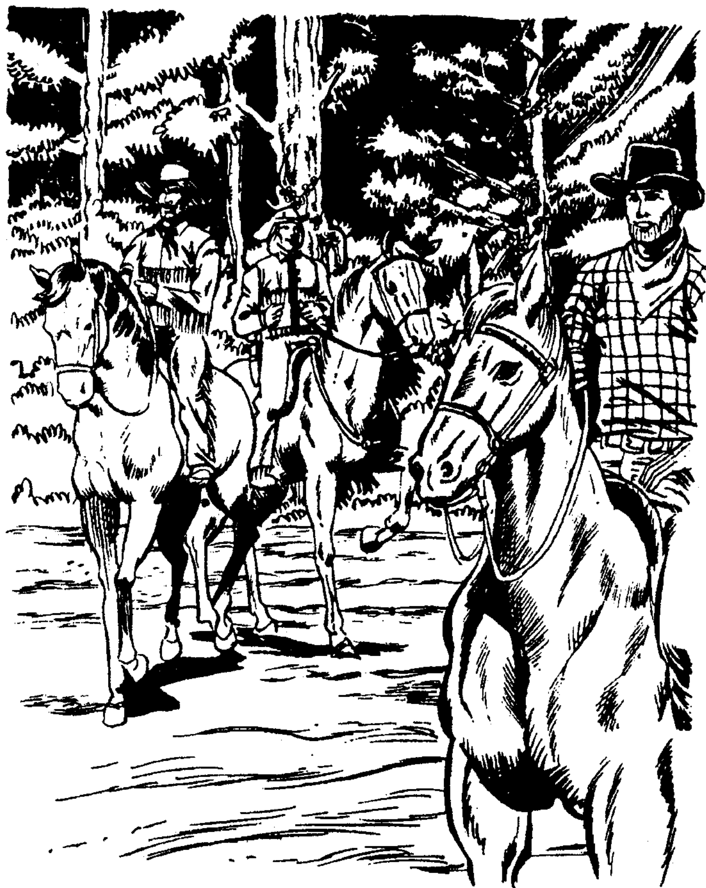


অসংখ্য প্রেইরী মুরগি চোখে পড়ল

১৩. বিদায়

দেশটি বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। আমাদের পেছনে বিশাল, ওষর মরুভূমি, শুকনো ঘাসে ভরা। সামনে চোখজুড়ানো সবুজ সমভূমি, গাছে ফুল ফুটে আছে। মোষের বদলে অসংখ্য প্রেইরী মুরগি চোখে পড়ল। ডজনখানেক মুরগি ধরে ঝোলায় পুরে নিলাম রাস্তা থেকে না নেমেই।

তিন-চার দিন বাদে কাউন্সিল গ্রোভে পৌঁছে গেলাম। এ যেন নতুন এক অভিজ্ঞতা। মনে হলো মহাকায় অ্যাশ, ওক, এলম, হিকরি এবং ম্যাপল



অ্যাশ, ওক, এলম, হিকরি এবং ম্যাপল গাছের খিলানের নিচ দিয়ে চলছি

গাছের খিলানের নিচ দিয়ে চলছি। সবগুলো গাছে আঙুরলতা ঝুলছে, ফলে ভর্তি। জঙ্গল অদ্ভুত নীরব। আমাদের চিৎকার-চেঁচামেচি ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই।

সীমান্তের উপনিবেশ এখান থেকে এক শ মাইল দূরে। দেশটা এখানে সবুজের পর সবুজ প্রেইরী। কেবল নদীর ধার দিয়ে কিছু বড় গাছের সারি। এটাই হলো গল্পকার আর কবিদের প্রেইরী।



আরকানসাস ট্রেইল ধরে নিয়মিত হামলা চালিয়ে হত্যা করছে নিরীহ পথচারীদের

আমরা বিপদ পেছনে ফেলে এসেছি। এখানকার ইন্ডিয়ানরা বিপজ্জনক নয়– স্যাক, ফক্স, কানসাস আর ওসাজেস জাতির বাস এখানে। আমাদের ভাগ্য বিরল রকমের ভাল। গত পাঁচ মাসে আমাদের ছোট দলটি এমন একটা এলাকা পাড়ি দিয়েছে যেখানে যেকোনো মুহূর্তে ডাকাতির কবলে পরতে পারতাম, জানও চলে যেতে পারত। কিন্তু আমাদের একটা পশুও চুরি হয়নি– একমাত্র ক্ষতি এক বুড়ো খচ্চর

র‍্যাটল স্নেকের কামড়ে মারা গেছে। দলের কোন সদস্যও আহত বা নিহত হয়নি।

তিন সপ্তাহ পড় সীমান্তে পৌঁছে জানতে পারলাম পনি আর কোমারিরা আরকানসাস ট্রেইল ধরে নিয়মিত হামলা চালিয়ে হত্যা করছে নিরীহ পথচারীদের, তাড়িয়ে নিচ্ছে ঘোড়া। ছোট-বড় যে দলই হোক, কারও রেহাই মিলছে না তাদের হাত থেকে। গত ছয় মাস ধরে এমন অবস্থা চলছে!

নিরানন্দ এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় আমরা আমাদের শেষ ক্যাম্প করলাম। কিন্তু পরদিন আমরা যখন ঘোড়ায় চড়লাম, সেদিনের সকালের মতো উজ্জ্বল হেমন্তের প্রভাত আর কখনও দেখিনি।

আমরা এখন অর্ধ সভ্য শনিদের এলাকা দিয়ে চলেছি। খুব সুন্দর জায়গা। ছোট ছোট জঙ্গলে হেমন্তের ছোঁয়া লেগেছে। জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ইন্ডিয়ান কৃষকদের কুটির। হলদে শস্য বাতাসে দোল খাচ্ছে। বড় বড় কুমড়ো শুকোচ্ছে সূর্যতাপে। রবিন আর ব্ল্যাকবার্ড উড়ে বেড়াচ্ছে। সবকিছুই আভাস দিচ্ছে অবশেষে আমরা সভ্যতার কাছাকাছি... ঘরের কাছে এসে পড়েছি।

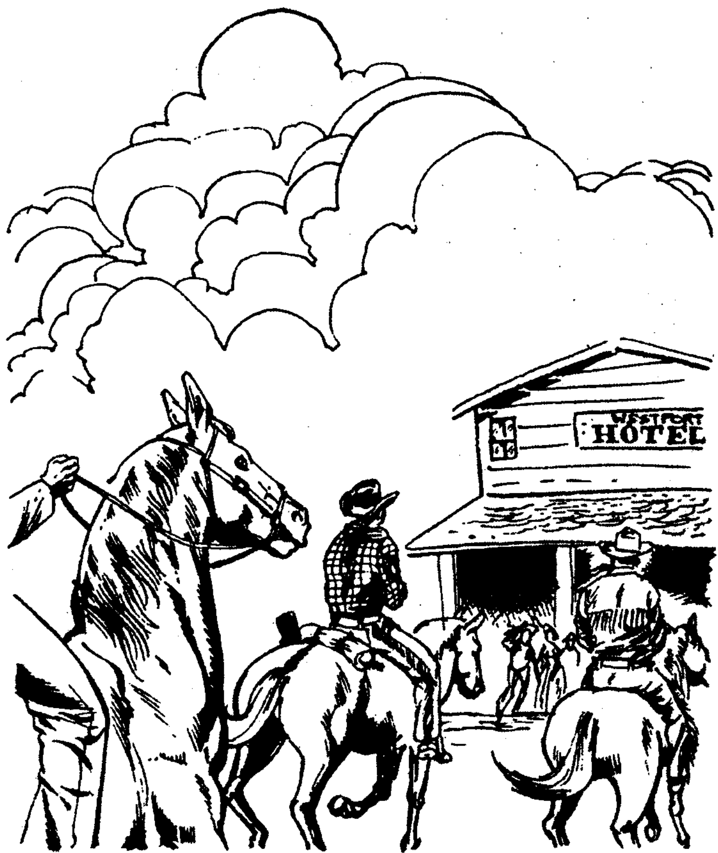
মিসিসিপি নদী ঘিরে থাকা জঙ্গল এখন আমাদের সামনে। আমরা শরতে এই রাস্তা ধরেই এসেছিলাম। কিন্তু হেমন্তের ছোঁয়ার সবই বদলে গেছে। জঙ্গলের বুনো আপেলগাছে আপেল ঝুলছে। বাতাসে ম ম গন্ধ। রাস্তার ধারে জন্মেছে লম্বা লম্বা ঘাস। গাছের আড়াল দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কাঠবেড়ালিরদল। ঝরা পাতার উপর ছুটে বেড়াছে পার্ট্রিজ আর ছায়াঢাকা ডালগুলোতে নেচে বেড়াচ্ছে সোনালি ওরিওল, ব্লুজে আর লাল আগুনের মতো রেডবার্ড। এই দৃশ্য আর শব্দাবলি আমাদের অন্তরে মিশ্র এক অনুভূতি জাগিয়ে তুলল।

কুইন্সি অনুভূতিটা প্রকাশ করল এভাবে, 'সভ্যতার আলাদা একটা স্বাদ আছে। তবে ফ্রান্সিস, বুনো জগৎ ছেড়ে যেতে আমার কষ্টই লাগছে।'



অবশেষে আমরা সভ্যতার কাছাকাছি... ঘরের কাছে এসে পড়েছি

গাছপালার ফাঁকে এক শ্বেতাঙ্গর বাড়ির ছাদ চোখে পড়ল। দ্রুতই আমরা ওয়েস্ট পোর্টে যাবার পথে কাঠের সেই জরাজীর্ণ সেতুটা পার হলাম। এ ছোট্ট সীমান্ত শহরটার বাসিন্দারা অদ্ভুত জিনিস নিশ্চিতভাবেই কম দেখে নি, কিন্তু আমাদের মত হতশ্রী বাহিনী একটা দল, সাথে আমাদের জরাজীর্ণ মালপত্র আর নির্জীব প্রায় জানোয়ার এ শহরেও কেউ কখনও দেখে নি।



আমাদের মতো হতশ্রী বাহিনী এ শহরে কেউ দেখেনি

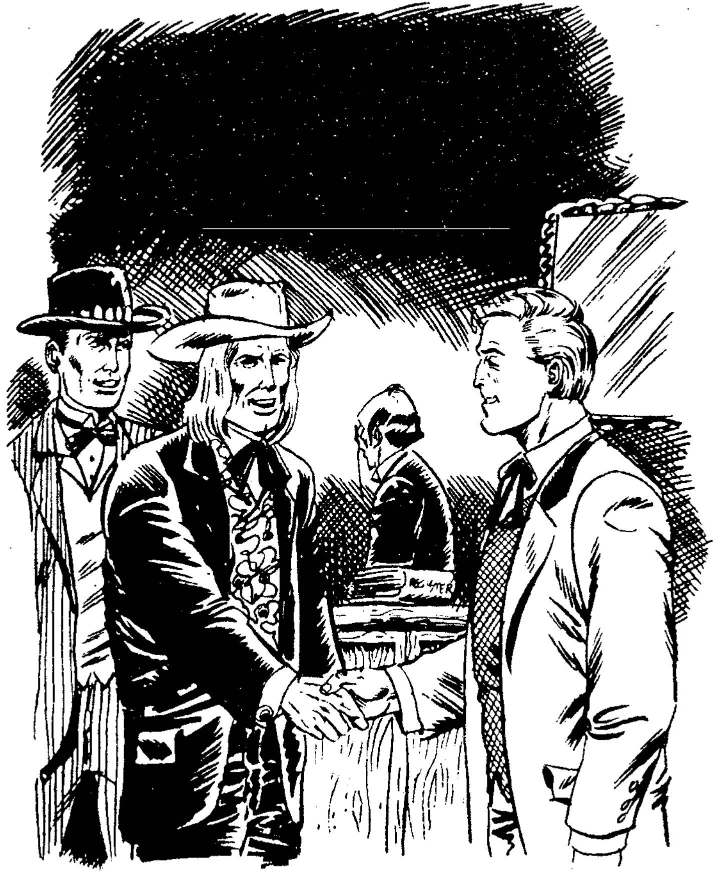
আমরা পরিচিত নানান দালানকোঠা পার হয়ে খোলা একটা মাঠে ক্যাম্প করলাম। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া ম্যানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আমাদের ঘোড়া, গাড়ি আর মালপত্র বেচে দিলাম। তারপর নতুন একটা গাড়ি ভাড়া করে ক্যানসাসে চললাম। এখানে সেই কাঠের তৈরি সরাইখানাটি পাঁচ মাস আগে যেমনটি দেখে গিয়েছি ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে। সরাইখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা আরও একবার মিসৌরী নদীর ছোট ছোট ঘূর্ণিগুলো দেখলাম শেষবারের মতো, হয়তো।



বিদায়! বন্ধুরা বিদায়, বিদায়!

পরদিন সন্ধ্যায় হেনরী, কুইন্সি এবং আমি একটি স্টিমবোটে চড়ে রওনা হলাম সেন্ট লুইসের পথে। ডেসলরিয়ার্স জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদেরকে বিদায় জানাল, হ্যাট, কোট, আর কামান মুখে ওকে অন্য আরেক চেহারায় দেখলাম।

চেঁচাতে লাগল সে, 'বিদায়! বন্ধুরা বিদায়, বিদায়! আবার কখনও রকি পাহাড়ে গেলে আমাকে সাথে নেবেন। অবশ্যই সাথে নেবেন!' সে মাথা



সন্ধ্যায় হেনরী শ্যাতিলন এলো বিদায় জানাতে

থেকে হ্যাট খুলে পাগলের মতো নাড়তে লাগল। যতক্ষণ আমাদের দেখতে পেল, হ্যাট নেড়েই গেল।

সেন্ট লুইসেতে পৌছাতে আট দিন লেগে গেল। তীরে পৌছেই ছুটলাম হোটেলে। ট্রাঙ্ক খুলে জামাকাপড় পরে নিলাম, দর্জির জাদুতে নিজেদেরকেই যেন চিনতে পারছিলাম না।

পূর্বে যাত্রা শুরু করার আগে সন্ধ্যায় হেনরী শ্যাতিলন এলো বিদায় জানাতে। একেবারে ধোপদুরস্ত অথচ সাদামাটা পোশাক পড়া

শ্যাতিলনকে দেখে কে বলবে এইমাত্র রকি পর্বতমালা থেকে ফিরে আসা এক দুর্ধর্ষ শিকারি সে! পনেরো বছর বয়স থেকে সভ্য মানুষদের মাঝে সব মিলে এক মাসও না কাটালেও ওর রুচি সহজাতভাবেই এত উন্নত যে ওর ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সহজেই চোখে পরে। ওর বর্তমান পোশাকটা লম্বা, খেলোয়ারসুলভ দেহ আর চমৎকার চেহারার সাথে চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছে।

ও যে আনুগত্য ও ভক্তি নিয়ে আমাদের সেবা করেছে, তা প্রশংসার অতীত। আমরা করমর্দন করলাম, আর আমাদের চেহারা বেদনাঘন হয়ে উঠল। ওয়েস্ট পোর্টে কুইন্সি ওকে একটা ঘোড়া উপহার দিল আর আমি দিলাম আমার রাইফেলটা। এই মুহূর্তে যখন আমি এটা লিখছি হেনরীর রাইফেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ রকি পর্বতমালার প্রতিধ্বনিকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছে।

বিদায়! বন্ধুরা বিদায়! বিদায়!

পরদিন সকালে সেন্ট লুইস ত্যাগ করলাম। দুই সপ্তাহ রেল, স্টেজকোচ এবং স্টিমবোট ভ্রমণ শেষে বাড়ি পৌঁছুলাম।

এই ছয় মাস ছিল উত্তেজনাময়। এই ছয় মাসে দু হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি। এমন জীবন সেখানে দেখেছি যা নিকট ভবিষ্যতে বিলীন হয়ে যাবে, কেননা সাদা মানুষেরা সেখানে বসতি গাড়তে শুরু করেছে। যে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, তাদের অধিকাংশই ধ্বংস হবে। পাহাড়ের ফাঁদপাতা শিকারি আর পথ-দেখিয়ে নিয়ে চলার পেশা অচিরেই অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হবে। শক্তিমান বুনো মোষের দলও হারিয়ে যাবে। তবে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি এই ভেবে যে, মানুষ আর পশুদের এমন একটা সময়কে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলাম, যখন বুনো পশ্চিম ছিল সভ্য সমাজের চোখের আড়ালে।